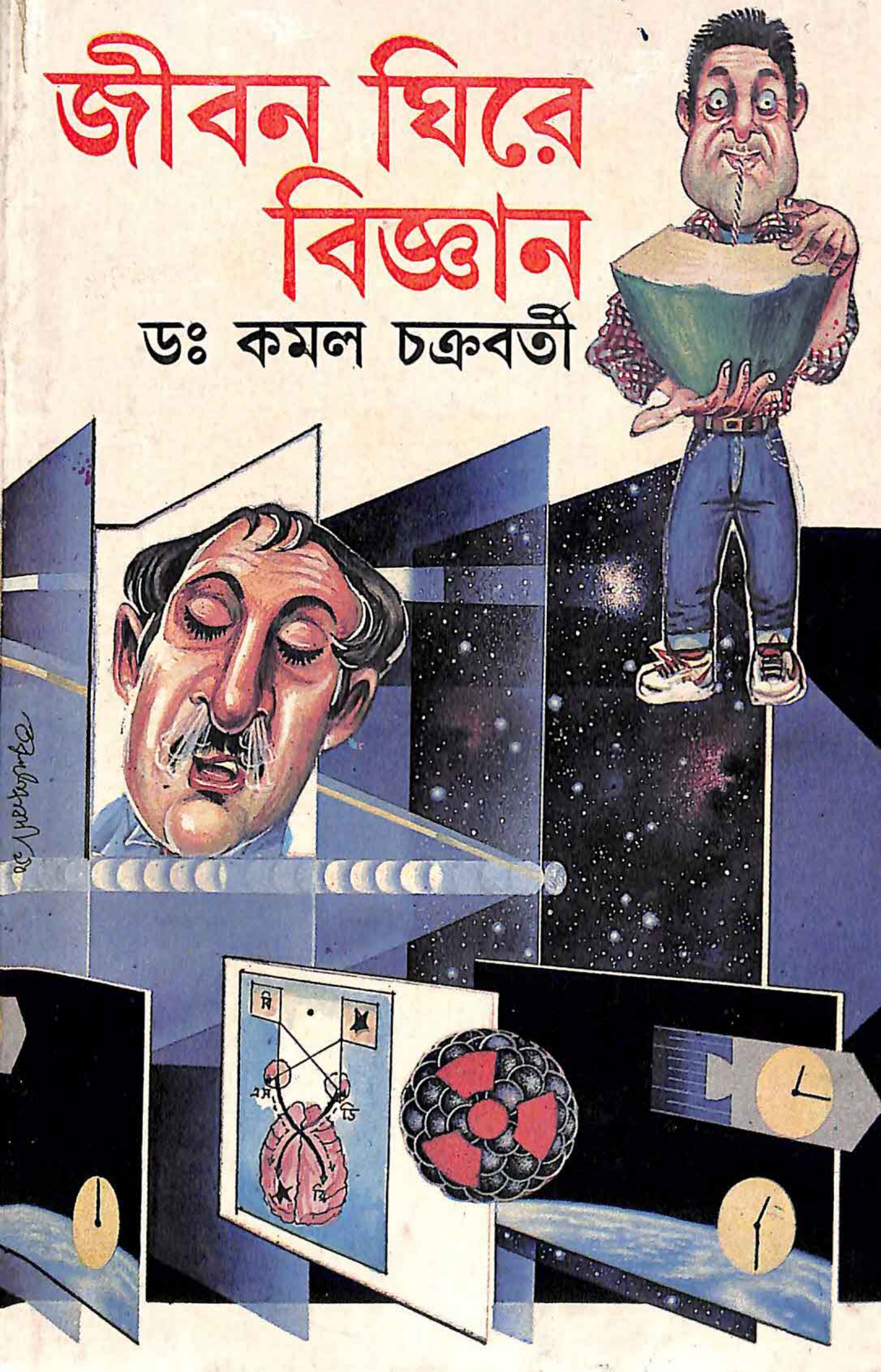
জীবন ঘিরে বিজ্ঞান

ডঃ কমল চক্রবর্তী



জীবন ঘিরে বিজ্ঞান

জীবন ঘিরে বিজ্ঞান

কমল চক্রবর্তী

দে'জ পাবলিশিং ॥ কলকাতা ৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ
বইমেলা।
মাঘ, ১৩৯৭
February 1991

প্রকাশক
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট
কলকাতা – ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ
তরুণ চক্রবর্তী

অঙ্গসজ্জা
বিশ্বনাথ সাহা

মুদ্রক
স্বপনকুমার দে
দে'জ অফসেট
১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রিট
কলকাতা – ৭০০ ০৭৩

দাম ঃ ২৫ টাকা,

Twentyfive only

আমার পাঁচ শুভানুধ্যায়ী

শ্রী মহেন্দ্রনাথ পাল

শ্রী মুকুল গুহ

শ্রী রুণু বোস

শ্রী তপনকুমার ঘোষ

শ্রী অশোককুমার মিত্র

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

বিজ্ঞানের ছড়া
বিজ্ঞান বিচিত্রা
বিজ্ঞান ভাবনা
জ্ঞানের আসর
অঙ্ক কষা সহজ
হাতে কলমে রসায়ন
অঙ্ক নিয়ে খেলা
কেমিস্ট্রি ক্যুইজ
ছড়ায় বিজ্ঞান
Rhymes on Science.

ভূমিকা

'জীবন ঘিরে বিজ্ঞান' বইটির বেশিরভাগ প্রবন্ধই আমাদের শরীরকে ঘিরে। দু'চারটে প্রবন্ধ একটু অন্যরকম, তবু তা' জীবনের প্রতিচ্ছবি বলা চলে। প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে নানা পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

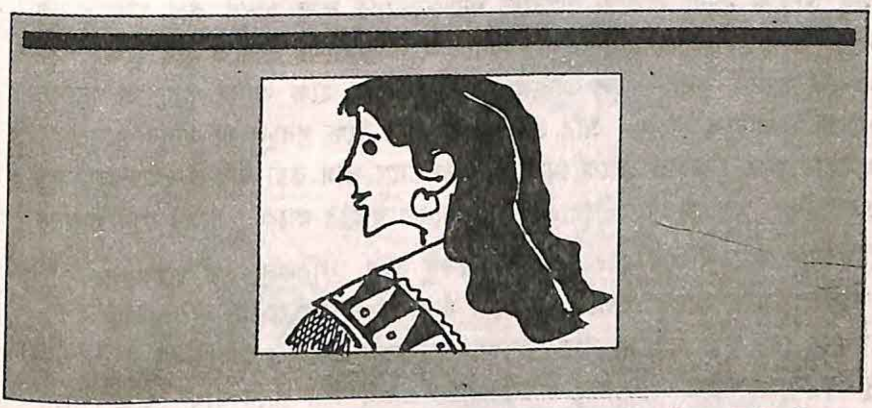
বইটির কয়েকটি প্রবন্ধ ডাক্তারিশাস্ত্রের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। সুতরাং ঐসব প্রবন্ধ সম্বন্ধে যদি কোন সুচিন্তিত ও নির্ভরযোগ্য মতামত কেউ দেন, তবে তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকব। এছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধ সম্পর্কেও যে কোন পরামর্শ সাদরে গ্রহণ করব।

কমল চক্রবর্তী
১/২/৯১

কালিন্দী হাউজিং এস্টেট,
কলকাতা - ৭০০ ০৮৯

-ঃ সূচীপত্র ঃ-

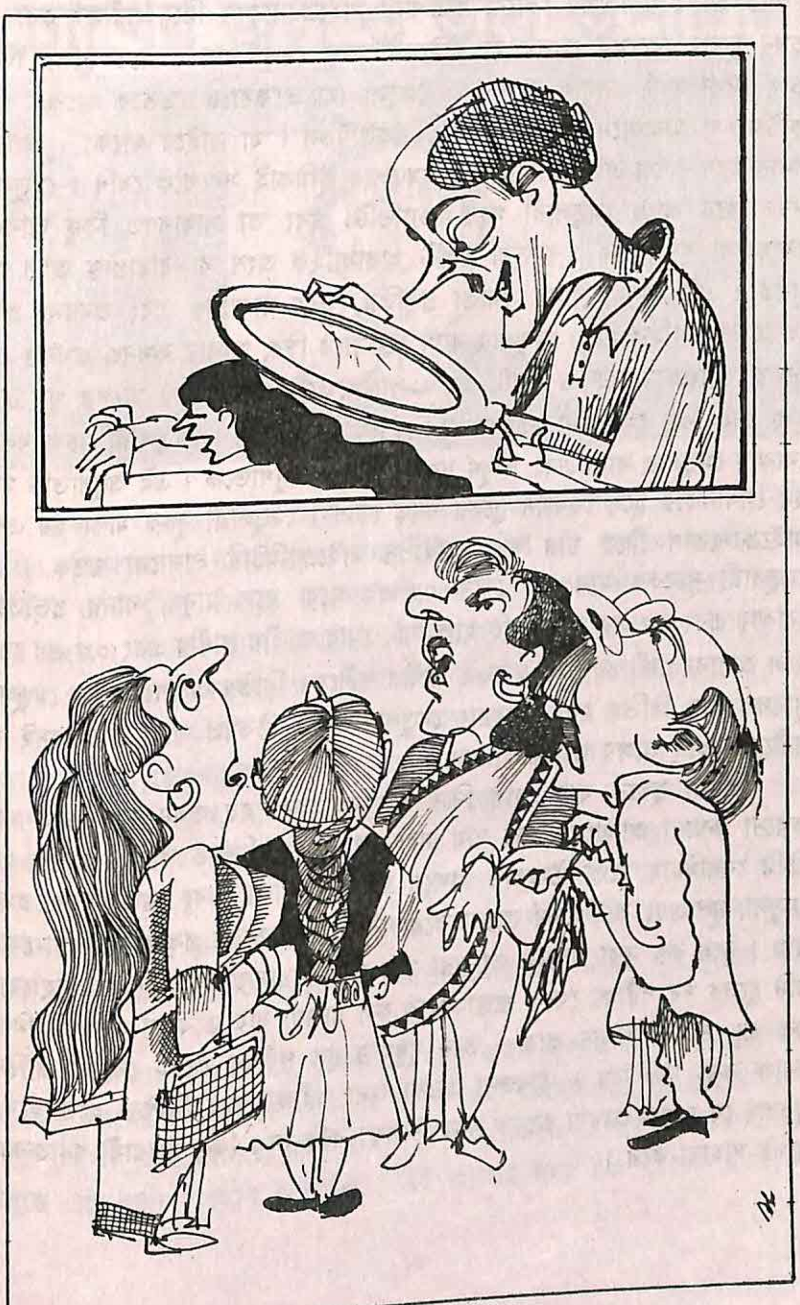
রহস্য উদঘাটনে চুলের ভূমিকা



ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান বোনাপার্টের নাম আমরা সবাই জানি। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভাবান এক যোদ্ধা। জীবনে বহুযুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। কিন্তু ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে বিখ্যাত ওয়াটারলুর যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বন্দী অবস্থায় সেন্ট হেলেনা দ্বীপে তিনি নির্বাসিত হন। তারপর দীর্ঘদিন এক দুরারোগ্য রোগে ভুগে ১৮২১ খ্রিস্টাব্দে তিনি মারা যান। তাঁর মৃত্যুর পর সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছিল যে তিনি পাকস্থলীর ক্যানসার রোগে মারা গেছেন। কিন্তু অনেকে তাঁর এইভাবে মৃত্যুকে মেনে নেননি। তাঁরা সন্দেহ করলেন যে আর্সেনিক নামে এক রাসায়নিক পদার্থ খাইয়ে তাঁকে মারা হয়েছে। আর্সেনিক হচ্ছে একটি দুর্বল বিষ। এটি শরীরে ধীরে ধীরে জমা হয় এবং একটি নির্দিষ্ট মাত্রার বেশি পরিমাণ শরীরে জমা হলে মানুষ মারা যায়। এই আর্সেনিক আবার চুলে জমা হয় বেশি। আর নেপোলিয়ানের চুল পরীক্ষা করেই তিনজন ডাক্তার ধরে ফেলেন যে তাঁকে আর্সেনিক প্রয়োগ করেই মারা হয়েছিল। যে তিনজন ডাক্তার এই পরীক্ষা করেছিলেন তাঁরা হলেন, ডাঃ ওয়াসেন, ডাঃ ফার্সিফুট এবং ডাঃ স্মিথ। তাঁরা জাদুঘরে রাখা নেপোলিয়ানের একগুচ্ছ চুল সংগ্রহ করে তাঁর মৃত্যুর বহু বছর পরে এই কাজ করেছিলেন। নিউট্রন অ্যাকটিভেশন পরীক্ষার সাহায্যে আর্সেনিকের উপস্থিতি তাঁরা বুঝতে পারেন। আর্সেনিকের পরিমাণ শরীরের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন হয়। চুলে ও নখে এর ঘনত্ব সাধারণত বেশি। দেখা গেছে ১৩০ মিগ্রা-র বেশি আর্সেনিক শরীরে ঢুকলে মানুষের মৃত্যু হয়। পানীয় জলে আর্সেনিক থাকলে যকৃতে ক্যানসার হয়। নেপোলিয়ানকে

হয়তো আর্সেনিকযুক্ত জল পান করতে দেওয়া হতো এবং সেই আর্সেনিক বিষেই তাঁর মৃত্যু হয়।

আমরা সিনেমায় দেখতে পাই বা গল্প পড়ে জানতে পারি যে অনেক সময় চুলের সাহায্যে একজন অপরাধীকে খুঁজে বার করা সম্ভব হয়েছে। যদিও শুধুমাত্র চুল পরীক্ষা করে একেবারে নিশ্চিত হওয়া যায় না, তবুও এই পরীক্ষার সঙ্গে অন্যান্য কিছু উপযুক্ত নমুনা থাকলে, অপরাধী শনাক্তকরণের কাজ সম্পূর্ণ করা যায়। চুল সংগ্রহ করে একজন অপরাধীর খোঁজ করতে হলে আমাদের জানতে হবে চুলের গঠন সম্পর্কে অনেক কথা। চুল আবার দু'রকম। এক হচ্ছে আসল চুল, যা মাথায় শক্তভাবে আটকে থাকে। আর এক ধরনের চুল হচ্ছে পরচুল যা মানুষ প্রয়োজনে ব্যবহার করে। আসল চুলকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—মূল, দণ্ড এবং টিপ। মূল ত্বকের গভীরে এবং দণ্ড ত্বকের বাইরে থাকে। চুলের শেষ প্রান্তকে টিপ বলে। কেশ মূল এবং কেশদণ্ডের কিছু অংশ 'ফলিকল' এর মধ্যে থাকে। 'ফলিকল' হচ্ছে ত্বকের ভেতরে ঢোকানো বাঁকা একটি বহিস্তকীয় খাপের মত। মূল যেখানে শেষ হয়েছে তাকে বলে কেশকন্দ (হেয়ার বাল্ব)। একটি জীবন্ত মূলকে মৃত মূলের থেকে সহজে চেনা যায়। যদি চুলকে জোর করে টেনে মাথা থেকে তোলা হয়, তবে জীবন্ত মূল চেনা যায় এবং মৃতমূল চেনা যায় সাধারণভাবে মাথা থেকে পড়া চুল দেখে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গের চুলের প্রস্থচ্ছেদ বিভিন্ন আকারের হয়। মাথার চুল গোলাকার বা ডিম্বাকার হয়, দাড়ি-গোঁফের চুল ডিম্বাকার হয়। তবে এর থেকে সঠিক কোনো সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় না। কারণ বিভিন্ন প্রাণীর চুলের প্রস্থচ্ছেদ বিভিন্ন আকারের হয়। ফরেনসিক তদন্ত করে চুল থেকে কিছু কিছু তথ্য জানা সম্ভব হয়। এই পরীক্ষায় দেখা হয় চুলগুলি মানুষের না অন্য কোনো প্রাণীর। যদি মানুষের হয় তবে তা পুরুষ না নারীর। চুল পরীক্ষা করে কোনো ব্যক্তির বয়স আন্দাজ করা যায়। পরীক্ষায় চুলের প্রতিসরাঙ্ক বের করেও কিছু কিছু তথ্য জানা যায়। অনেক কালো বা খয়েরি সুতোর মতো পদার্থ আছে যেগুলির চুলের সঙ্গে বেশ মিল আছে এবং সেগুলিকে ঠিকভাবে চেনা যায় সাধারণ মাইক্রোসকোপ দিয়েই। মাইক্রোসকোপের পরীক্ষায় চুলটি কোন্ পেশার মানুষের তাও অনেক সময় বলা সম্ভব হয়। যেমন একজন মিলের শ্রমিকের চুলে বিভিন্ন শস্যের গুঁড়ো বা ময়দার গুঁড়ো, একজন কলকারখানার শ্রমিকের চুলে ধাতু বা ধাতবজাতীয় পদার্থের গুঁড়ো পাওয়া যায়। আবার ইটখোলার লোকের চুলে ইটের গুঁড়ো এবং গাড়ি মেরামতকারী শ্রমিকের চুলে গ্রিজ বা পেট্রোলজাতীয় পদার্থের চিহ্ন পাওয়া যায়। কোনো চুলকে যদি কেটে ছোটো করা হয় বা উষ্ণ জলে বা বাষ্পে দাহ করা হয় তাও পরীক্ষা করে বোঝা যায়। চুলের ছাঁট থেকে বোঝা যায় যে, কি জাতীয় অস্ত্র দিয়ে চুল ছাঁটা হয়েছে। দেখা গেছে যে, কোনো মৃত ব্যক্তিকে অনেকক্ষণ মাটিতে



শুইয়ে রাখলে তার চুল ধীরে ধীরে লালচে হয়। মাটিতে একধরনের পদার্থ আছে যাকে হিউমাস বলে। সেটি বেশি পরিমাণে মাটিতে থাকলে তার চুলের বর্ণ বেশি লালচে হয়। চুল যখন কোনো শক্তিশালী মাইক্রোসকোপ দিয়ে পরীক্ষা করা হয়, তখন চুলের কোষের ভেতর বা বাইরের সজ্জা দেখা যায়। এতে চুলের তিনটি ভাগ দেখা যায়, সেগুলি হলো (১) মেডুলা (যা একেবারে ভেতরে থাকে), (২) কর্টেক্স (যা মাঝখানে থাকে) এবং (৩) কিউটিকল (যা বাইরে থাকে)। অপরাধী শনাক্তকরণ কাজে এই তিনটির মধ্যে মেডুলার ভূমিকাই সবথেকে বেশি। মেডুলাকে দখল করে আছে মেডুলারী গহ্বর (ক্যাভিটি) এবং তা সাধারণত কিছু অবিন্যস্ত কোষদ্বারা পূর্ণ থাকে। মেডুলা একটি ধারাবাহিক অংশ বা বাধাপ্রাপ্ত অংশ হতে পারে। এটি মানুষ, বানর, ঘোড়া প্রভৃতির ক্ষেত্রে বাধাপ্রাপ্ত এবং অন্যান্য প্রাণীর ক্ষেত্রে ধারাবাহিক হয়। মেডুলার ব্যাস একেবারে স্থির, আবার কখনও কখনও একই চুলের পর্যায়ক্রমে সরু ও মোটা হয়। বাস্তবক্ষেত্রে এই ব্যাসের মাপের খুব একটা মূল্য নেই কিন্তু মেডুলারী সূচকের (M.I) খুব মূল্য আছে। মেডুলারী সূচক বলতে বোঝায় মেডুলার ব্যাস এবং সম্পূর্ণ চুলের ব্যাসের অনুপাতকে। এই অনুপাতটি মাপা হয় সেখানকার চুলে যেখানে চুলের ঘনত্ব বেশি। মেডুলারী সূচক মাপা হয় একটি মাইক্রোসকোপ দিয়ে যার সঙ্গে আইপিস মাইক্রোমিটার লাগানো থাকে। এই মেডুলারী সূচকের মান ০.১ থেকে ০.৪-এর মধ্যে হলে মানুষ, বানর প্রভৃতিকে বোঝায় এবং ০.৫-এর কাছাকাছি হলে গরু, মোষ জাতীয় প্রাণীর এবং ০.৫-এর বেশি হলে অন্যান্য প্রাণী বোঝায়। একই প্রাণীর শরীরের বিভিন্ন অংশের চুলের মেডুলারী সূচকের মান বিভিন্ন হয়। সুতরাং মেডুলারী সূচক ঠিকমত জানা গেলে সেই চুল শরীরের কোন্ অঙ্গের তা বোঝা যায়।

কোনো চুলকে যখন তাপ দিয়ে অল্প দগ্ধ করা হয় তখন তা কুঁচকে যায়, কখনো কখনো আকারে বেড়ে যায় এবং তা ধূসর বর্ণ লাভ করে। চুলকে ২০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস মতো উষ্ণতায় রাখলে তা লালচে হয় এবং মেডুলা দগ্ধ হয়। মেডুলা, মূল এবং কর্টেক্স বর্ণ ভালো করে পরীক্ষা করে চুলের প্রকৃতি অনেকটা বোঝা যায়। চুলে রঙ করা থাকলে তা ধরা যায় মাইক্রোরাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে। যদি চুলের সব পরীক্ষা থেকে সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায় তবে তা অপরাধী নির্ণয়ে এক বড় ভূমিকা পালন করে। তবে শুধুমাত্র চুল পরীক্ষা করেই কোনো ব্যক্তিকে শনাক্ত করা ঠিক নয়। তারজন্য আরো অন্য পরীক্ষা করে নিশ্চিত হতে হবে। সুতরাং যে চুলকে আমরা অনেক সময় উপেক্ষা করি তাও কিন্তু অপরাধী শনাক্তকরণে যথেষ্ট সাহায্য করে।

চোখের জল ও তার উপাদান



কাঁদানে গ্যাসের খপ্পরে আমাদের অনেককেই জীবনে পড়তে হয়েছে । বিভিন্ন মিছিল, বিক্ষোভ বা প্রতিরোধকে বাধা দিতে পুলিশ এই গ্যাসের ব্যবহার করে থাকে । তবে পুলিশ কাঁদানে গ্যাসের সঙ্গে লাঠি এবং প্রয়োজনে গুলিরও ব্যবহার করে থাকে । কাঁদানে গ্যাস আমাদের কাঁদিয়ে ছাড়ে । আমরা তখন চোখে ভাল দেখতে পাই না । আমাদের চোখ জ্বালা করে । চোখ দিয়ে জল ঝরে ।

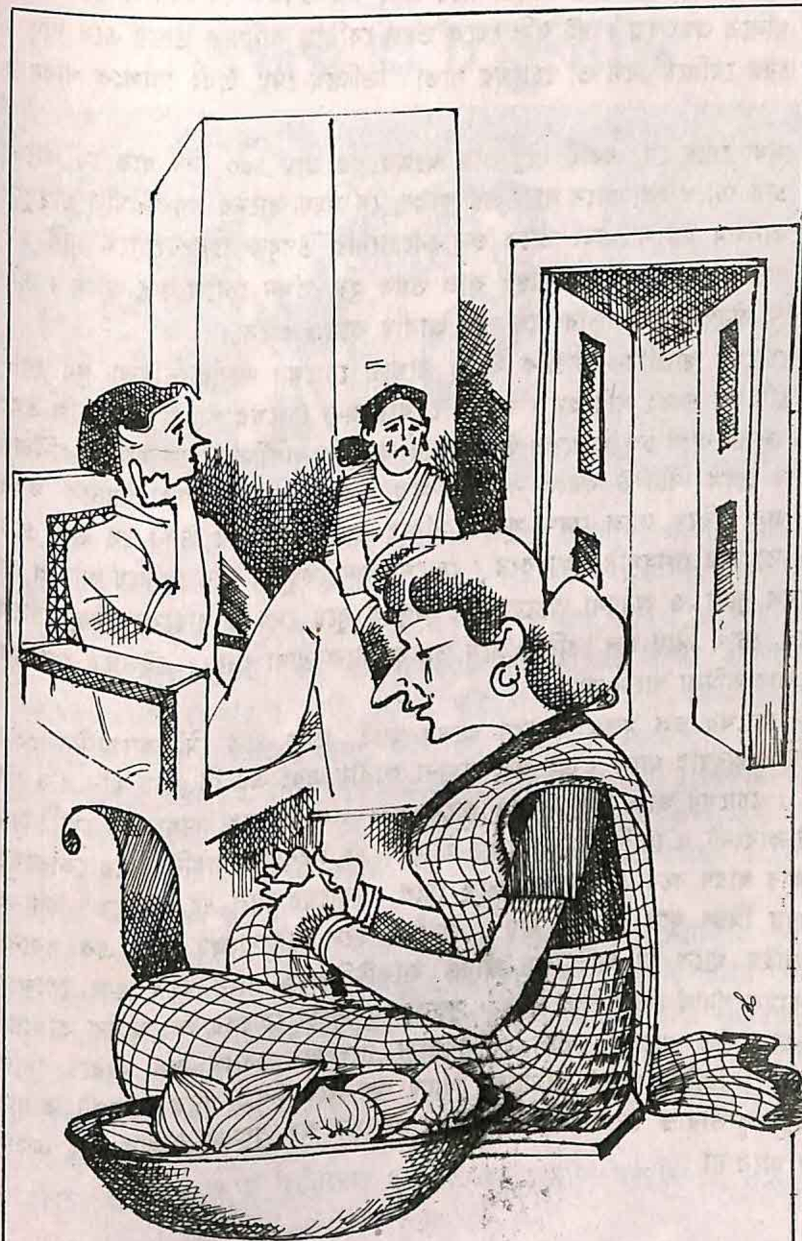
তবে এভাবে কান্নার জন্য আমাদের বাধ্য করা যাবে না, কারণ আমরা তা এড়াতে পারি । চোখের জল সাধারণত আসে স্বাভাবিক কান্না থেকে এবং সে কান্না দেখা দেয় শোক, দুঃখ, ব্যথা, মান–অভিমান প্রভৃতি থেকে । কারো কারো ক্ষেত্রে অবশ্য কান্নার সময় চোখে জল দেখা যায় না । কবি চোখের জলে ভেজাতে চেয়েছেন শুকনো ধুলো, তাই কবিকণ্ঠ শুনিয়েছে 'কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না, শুকনো ধুলো যত !' অর্থাৎ চোখের জল যদি বেশি হত তাহলে শুকনো ধুলোকে ভিজিয়ে দেওয়া যেত, আর তা উড়ে এসে চোখে পীড়ার সৃষ্টি করতে পারত না ।

শুধু কি আমাদের দেশেই পুলিশ এই গ্যাস ব্যবহার করে মিছিল, ছাত্রবিক্ষোভ বা অন্য ধরনের বিক্ষোভকে ঠেকাতে ? না–এই ধরনের গ্যাসের প্রয়োগ অনেক আগে থেকেই হয়ে আসছে নানা দেশে । প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানরা বিপক্ষদলের বিরুদ্ধে এই গ্যাস ব্যবহার করেছিল । এই কাজের জন্য এক ধরনের রাসায়নিক

পদার্থ তারা ব্যবহার করেছিল যা চোখকে ফুলিয়ে দিত আর চোখ দিয়ে দরদর করে জল পড়ত। সে অবস্থায় একজন লোক চোখে কিছু দেখতে পেত না। কাঁদানে গ্যাস সাময়িকভাবে একজনের চোখকে অকেজো করে দেয়। এইসব কাঁদানে গ্যাসের মধ্যে কয়েকটি রাসায়নিক দ্রব্য থাকে। সাধারণত এই কাজে ব্যবহার করা হয় আলফা-ক্লোরো অ্যাসিটোফেনোন এবং বিটাব্রোমোবেনজিল সায়ানাইড নামে দুটি যৌগ। আমরা জানি যে, চোখ পরীক্ষা করার সময় কয়েকবার অ্যাট্রোপিনের ফোঁটা চোখে দেওয়া হয় এবং তারপর থেকে আমরা ভাল দেখতে পাই না। বিশেষ করে সূর্যের আলো আমাদের চোখকে কষ্ট দেয়। তাই এইসব রাসায়নিক পদার্থগুলোকে হয়ত আমরা সাময়িকভাবে নিন্দা করব। কিন্তু এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য অন্যরকম রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা যেতে পারে।

চোখের জল দেখা দেয় অনেক কারণে এবং তা হতে পারে পেঁয়াজের ঝাঁজ, ধোঁয়া, ভয়, দুঃখ, আঘাত, চোখের রোগ প্রভৃতির জন্য। এই জলের সঙ্গে বেরিয়ে আসে কিছু শর্করা ও রোগপ্রতিষেধক দ্রব্য। বিভিন্ন ব্যক্তির যে চোখের জল পাওয়া যায়, সেগুলির উপাদান সবসময় এক হয় না। পুরুষ ও নারীর চোখের জলের উপাদানও পুরোপুরি এক হয় না। কান্নার তীব্রতার উপরও চোখের জলের পরিমাণ নির্ভর করে। কোন মানুষ কাঁদলে তার মনের দুঃখ অনেকটা লাঘব হয় এবং সে কিছুটা সুস্থবোধ করে। এবং তাতে কান্নার তীব্রতা ধীরে ধীরে কমে যায়। কান্নার সময় দেহ থেকে কিছু কিছু দূষিত পদার্থ বেরিয়ে যায়। সুতরাং কান্নার সময় চোখের জল দূষিত পদার্থকে ধুয়ে দিয়ে মানুষকে অনেকটা সুস্থ রাখে। চোখের জল মনের দুঃখ ও চোখ, দুটোকেই ধুয়ে দেয়। তবে দুঃখেই শুধু চোখে জল আসে না, আনন্দের সময়ও কখনো কখনো তা বেরিয়ে আসে এবং তাকে আনন্দাশ্রু বলা হয়। একদল বিজ্ঞানীর ধারণা যে, এইসব পদার্থ চোখের উপশিরাতে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে এবং তখন নির্দিষ্ট গ্রন্থি থেকে জল বেরিয়ে শরীরের ময়লা দূর করে। চোখে প্রদাহ সৃষ্টি হলে, চোখে জল দেখা দেয়। পেঁয়াজ কাটার সময় বেশি করে জল বেরিয়ে আসে। হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগলে বা সর্দি, কাশি ও বমির সময় কখনও কখনও চোখের জল বেরিয়ে আসে।

কোন কোন সময় চোখের জল পরীক্ষা করে রোগ নির্ণয় করা হয়। দেখা গেছে যে, পাণ্ডুরোগগ্রস্ত রোগীর চোখের জল অনেক সময় হলদে হয়। চোখের জলে যে রোগপ্রতিষেধক এনজাইম থাকে, এই সময় তা হার মানে। চোখের জল তৈরি হয় টিয়ার গ্রন্থি এবং ল্যাকরিমাল গ্রন্থির সাহায্যে। এই গ্রন্থিগুলি আবার দু ধরনের—হার্ডেরিয়ান গ্রন্থি এবং প্রকৃত ল্যাকরিমাল গ্রন্থি। হার্ডেরিয়ান গ্রন্থিগুলি সরীসৃপ প্রাণী ও পাখিদের ক্ষেত্রে বেশ সক্রিয়। কিন্তু সীল, তিমি প্রভৃতির ক্ষেত্রে হার্ডেরিয়ান গ্রন্থিগুলি তত সক্রিয় নয়। এরা তৈলাক্ত পদার্থ নিঃসরণ করে। টিয়ার গ্রন্থিগুলি চোঙের মত। এদের মধ্যে থাকে প্রধানত নিঃসরণক্ষম ও সংকোচনক্ষম



কিছু কোষ। মানুষের প্রতিটি টিয়ার গ্রন্থির আকার হচ্ছে এক একটি বাদামের মত, এবং তা চোখের বাইরে এক কোণে থাকে। এর মধ্যে থাকে নালী, যার ভেতর দিয়ে তরল পদার্থ যাতায়াত করতে পারে এবং নিঃসরণক্ষম কোষের মাধ্যমে তরল একটি থলিতে জমা হয়। এই থলি থেকে তরল বেরিয়ে কর্নিয়ার উপরে এসে পড়ে। বেশি তরল বেরিয়ে এলে তা চোখের পাতা ভিজিয়ে দেয়, এবং চোখকে পরিষ্কার করে।

দেখা গেছে যে, একটি শিশু তার জন্মের পর প্রায় ১০০ দিন ধরে যে কাঁদে, তখন তার চোখে জল আসে না। এর কারণ, সে সময় তাদের ল্যাকরিমাল গ্রন্থিগুলি বেশি কার্যক্ষম হয় না এবং তাতে জল বেরোনোর উপযুক্ত তরল চোখে সৃষ্টি হয় না। পরে যখন ল্যাকরিমাল গ্রন্থির কাজ উন্নত হয়, তখন চোখে জল আসে। এই জল পড়া অবশ্য বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার কমেও আসে।

চোখের স্বাভাবিক কাজকে বজায় রাখতে চোখের জলের ভূমিকা খুব বেশি এবং এটি সব সময়ই সৃষ্টি হয়। আমরা দেখার জন্য চোখের পাতা খুলে রাখি এবং তাতে জলের বাষ্প চক্ষুগোলকের উপর থেকে ক্রমাগত বাষ্পীভূত হয়ে যায়। কর্নিয়ার শুষ্কভাব চোখ পিটপিট করতে সাহায্য করে! জলে চোখের পাতা আটকে থাকে এবং জল শুকিয়ে গেলে চোখ খুলতে সুবিধে হয়। কর্নিয়ার উপর যে জল এসে পড়ে, তা তার কোষগুলি রক্ষা করে। চোখের জল কিছুক্ষণ ধরে বেরিয়ে আসলে তা চোখের ধুলো ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে ধুয়ে দেয়। বাইরের কিছু চোখে পড়লে, চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এসে তা বস্তুটিকে বাধা দেয়। এইভাবে চোখের জল তার ভূমিকা পালন করে।

চোখের জল মূলত সাধারণ জলের মতই, তবে এতে মিউকোপ্রোটিন তেল ভাসমান অবস্থায় থাকে। এই জল সামান্য ক্ষারীয় এবং এর পি এইচ মান ৭.৪ এর মত। চোখের জলে কিছু লবণও থাকে এবং লবণের মধ্যে সাধারণত সোডিয়াম বাই-কার্বনেট ও সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকে। এই লবণগুলি আয়নিত হয়ে কোলয়েড আকার ধারণ করে এবং ধুলোর সঙ্গে মেশে। চোখের জলে এই কোলয়েড কণা ও ধুলোর মিশ্রণ ধুয়ে বেরিয়ে যায়। চোখের জলে লাইসোজেম নামে এক ধরনের এনজাইম থাকে যা অতি ক্ষুদ্র জীবন্ত ব্যাকটিরিয়াকে ধ্বংস করে এবং চোখকে সংক্রামক পদার্থ থেকে রক্ষা করে। সুতরাং দু ফোঁটা চোখের জল অনেক কারণেই পাওয়া যেতে পারে। ভাল অভিনেতারা প্রয়োজনে চোখে জল ঝরিয়ে দিতে পারেন। বিভিন্ন পদার্থ আমাদের চোখে জল এনে দিতে পারে। কপট কান্নায় আমরা কুম্ভীরাশ্রু দেখাতে পারি। তাই চোখের জল শুধুমাত্র কান্নার ফল, একথা বলা যাবে না।

অন্ধত্ব ও চক্ষুব্যাঙ্ক



অন্ধত্ব মানুষের জীবনের এক বড় অভিশাপ। তবে বিজ্ঞানের কল্যাণে আজকাল অন্ধদের এক বিরাট অংশ দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাচ্ছে। অন্ধদের উপযুক্ত শিক্ষাদীক্ষা দিতে পারলে তারাও অন্যান্য মানুষদের মত বাঁচার সার্থকতা খুঁজে পাবে। অন্ধত্ব মানুষের জীবনে বিরাট বাধা ঠিকই, কিন্তু এই বাধাকেও অতিক্রম করে জীবনে সাফল্যলাভ করেছিলেন হেলেন কেলার। তিনি শুধুমাত্র দৃষ্টিহীন ছিলেন না, সেইসঙ্গে ছিলেন শ্রবণশক্তিহীন। তাঁর বাক্‌শক্তিও অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। অন্ধদের শিক্ষার জন্য যে ব্রেইল বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়, সেই বর্ণমালার শিক্ষা নিয়েছিলেন তিনি। শিক্ষার ফলে তাঁর হাত দিয়ে বিখ্যাত বিখ্যাত বই বেরিয়েছে। তিনি অন্ধদের ব্যথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করে তাদের ব্যথা দূর করার জন্য আজীবন চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি আমেরিকান ফাউণ্ডেশন ফর ব্লাইণ্ডের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

আর এক ধরনের অন্ধতা হচ্ছে বরফের অন্ধতা। ইংরাজীতে বলে 'স্নো-ব্লাইণ্ডনেস'। এটি এক অস্থায়ী অন্ধত্ব। এর ফলে মানুষ সাময়িকভাবে তার দেখার ক্ষমতা হারায়। বরফের উপর প্রতিফলিত হয়ে অতিবেগুনি রশ্মি যদি চোখে পড়ে তবে 'স্নো-ব্লাইণ্ডনেস' হয়। অতিবেগুনি রশ্মি চক্ষু-গোলকের বাইরের কলাকে দগ্ধ করতে পারে। এই অন্ধতা বেশিদিন থাকে না। কালো রঙের চশমা ব্যবহার করে এই অন্ধতা দূর করা যায়।

চোখে ছানি পড়লে তা কাটানোর প্রয়োজন হয়। ছানি সময়মত না কাটালে

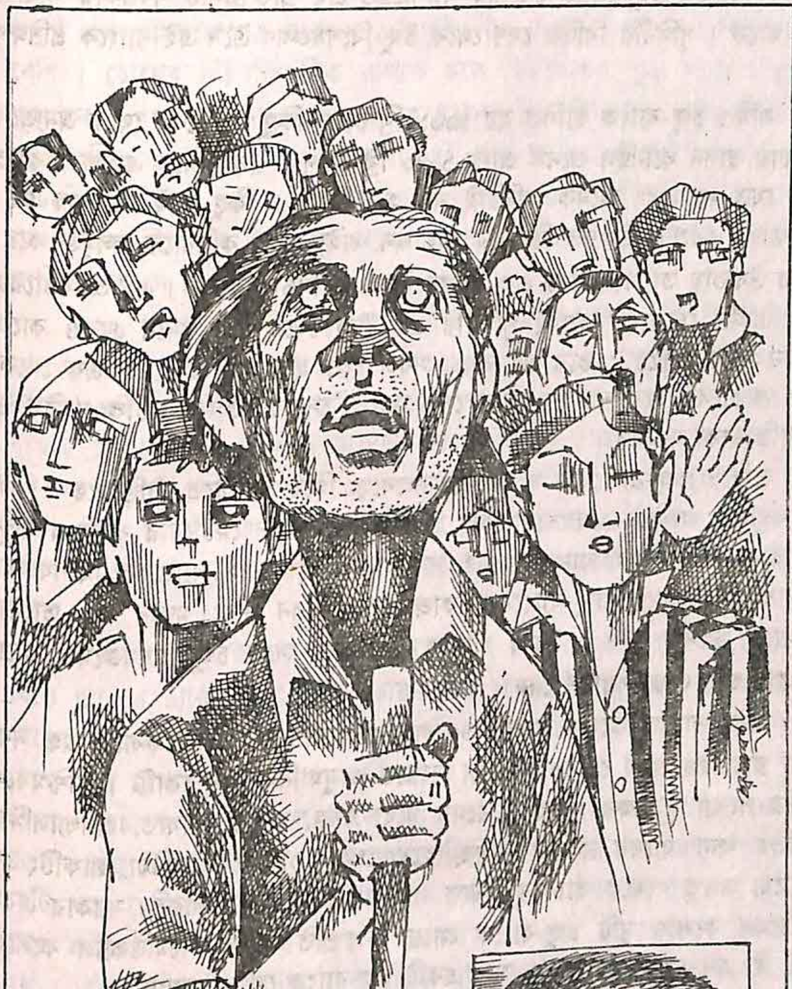
অন্ধ হয়ে যাবার সম্ভাবনা খুব বেশি । এই ছানি পড়ার সম্ভাবনা আবার বাড়ে 'অ্যাসপিরিন' ওষুধ বেশি মাত্রায় খেলে । যাঁরা প্রায়ই অ্যাসপিরিন খান তাঁদের ক্ষেত্রে ছানি পড়ার সম্ভাবনা বেশি থাকে । সম্প্রতি ভারত-মার্কিন যৌথ গবেষণায় এই তথ্য জানা গেছে । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল আই ইনস্টিটিউট এবং ভারতের রাজেন্দ্রপ্রসাদ সেন্টার ফর অপথ্যালমিক সায়েন্সের গবেষকরা গবেষণা করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন এবং অত্যধিক অ্যাসপিরিন গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন ।

দৃষ্টিহীনদের জ্ঞানের আলো বিতরণ করা সত্যিই সুখের ব্যাপার, কিন্তু যদি তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে দেওয়া যায় তবেই তো তারা আরও বেশি লাভবান হবে । যারা অচ্ছোদপটল (কর্নিয়া) স্বচ্ছতা হারিয়ে দৃষ্টিহীন হয়েছে তাদের পূর্ণ দৃষ্টি পাওয়া সম্ভব, এর জন্য একজনের কর্নিয়া অন্যকে দান করার প্রয়োজন । তবে এ ব্যাপারে অসুবিধে হচ্ছে চোখের কর্নিয়া সংগ্রহ করা নিয়ে । মানুষ বিভিন্ন কারণে মৃত্যুর পরেও তার চোখ অপরকে দান করার অঙ্গীকার করতে পারছে না । এর ফলে প্রয়োজনীয় কর্নিয়া পাওয়া যাচ্ছে না । মানুষের কল্যানমুখী মনকে জাগিয়ে তুলতে পারলে্ মানুষের মৃত্যুর পর তার চোখকে ব্যবহারের অনুমতি দিতে বাধা হবে না । এই চোখ সংগ্রহের জন্য চক্ষু-ব্যাংক গঠন করা হয়েছে । এই ব্যাংক বৈজ্ঞানিক উপায়ে সুস্থ কর্নিয়া সংগ্রহ করে এবং তা প্রয়োজনমত অপরকে সরবরাহ করে । কর্নিয়ার অস্ত্রোপচার এবং তা অন্যের চোখে ঠিকভাবে স্থাপন বর্তমানে সাফল্যের সঙ্গেই সম্ভব হচ্ছে । কর্নিয়ায় রক্তনালী খুব কম থাকায় অন্যের দেহের টিসুর সঙ্গে সহজেই তা মিল খায় । এ কাজ করার জন্য উপযুক্ত শল্যচিকিৎসক প্রয়োজন, নইলে এত মূল্যবান কর্নিয়া নষ্ট হয়ে যেতে পারে ।

দৃষ্টিশক্তি বাড়ানোর জন্য এক ধরনের নতুন চিকিৎসাপদ্ধতি অবলম্বন করা হচ্ছে রাশিয়ায় । পদ্ধতিটির নাম গালভানোপাংচার । রোগীর চামড়ায় একটি তড়িদ্দ্বার চেপে ধরে ডাক্তাররা সঠিক জায়গা খুঁজে নেন এবং সেখানে পরিমাণমত পরাণুবিদ্যুৎ প্রয়োগ করেন । এতে অক্ষিপেশীর আক্ষেপ কমে এবং দৃষ্টিশক্তি বেশ বেড়ে যায় ।

অন্ধদের মধ্যে যাদের বয়স ১৮ থেকে ৪০, তাদের ক্ষেত্রে নতুন কর্নিয়া সংযোজন করে বেশি সুফল পাওয়া গেছে । সাধারণত কর্নিয়া তুলে আনার কাজটা কোন ব্যক্তির মৃত্যুর ২-৩ ঘণ্টার মধ্যেই করতে হয় । কর্নিয়া হল চোখের সামনের স্বচ্ছ অংশ । চক্ষু-ব্যাংকের রেফ্রিজারেটরে চোখ রাখা হয় খুব সযত্নে ।

চক্ষু-ব্যাংক দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এবং এই জনপ্রিয়তার জন্য একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান মূলতঃ কৃতিত্ব দাবি করতে পারে । প্রতিষ্ঠানের নাম ইনটারন্যাশনাল আই ফাউণ্ডেশন সংক্ষেপে আই. ই. এফ । এই প্রতিষ্ঠান ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ওয়াশিংটন ডিসিতে । তখন তার নাম ছিল ইণ্টারন্যাশনাল আই ব্যাংক । এই ব্যাংক কর্নিয়াঘটিত অন্ধতা বা প্রায়-অন্ধ মানুষের



বন্ধুস্বরূপ । এই প্রতিষ্ঠান অন্ধত্ব দূরীকরণে গবেষণা আর প্রশিক্ষণের কাজে সাহায্য করে । বিদেশে চক্ষু-ব্যাংক খোলার ব্যাপারেও এই প্রতিষ্ঠানটি সর্বপ্রকার সাহায্য করে থাকে । পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে চক্ষু-বিশেষজ্ঞগণ এসে এই ব্যাংকে প্রশিক্ষণ নেন ।

যদিও চক্ষু-ব্যাংক স্থাপিত হয় ১৯৬১ খ্রিস্টাব্দে কিন্তু একজনের থেকে অন্যজনে কর্নিয়ার স্থাপন ঘটেছিল অনেক আগে ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে । প্রথম দিকে একাজ ঠিকমত করা যেত না এবং অনেক কর্নিয়াই নষ্ট হয়ে যেত । কিন্তু আই. ই. এফ-এর প্রতিষ্ঠাতা এবং মেডিক্যাল ডিরেক্টর ডাঃ জন. এইচ. কিং কর্নিয়াকে জলমুক্ত করে ঘরের উষ্ণতায় তা সংরক্ষণের এক বিশেষ উপায় আবিষ্কার করেন । এই আবিষ্কারের ফলে একটি চোখকে সহজেই পৃথিবীর এক দেশ থেকে অন্য দেশে এনেও কাজে লাগান সম্ভব হয়েছে । তবে এই কাজে সফল হতে হলে শুধু, আই. ই. এফ থেকে চোখ পাঠালেই হবে না, যে দেশে সেটি যাবে, সেখানে উপযুক্ত চিকিৎসাবিদ ও যন্ত্রপাতি থাকা দরকার ।

ভারতে চক্ষু-ব্যাংকের সংখ্যা এখন বেড়ে গিয়ে ৩৪ টিতে দাঁড়িয়েছে । এই ব্যাংকগুলির কাজকর্ম দেখাশোনা করা এবং তার প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে নতুন দিল্লীর ন্যাশনাল আই ব্যাংক যথেষ্ট সাহায্য করছে । এই ব্যাংকের বিশেষজ্ঞরা জনসাধারণের কাছে চক্ষু-ব্যাংকের কাজ তুলে ধরেন এবং মৃত্যুর পর তাদের চক্ষুদানে উৎসাহ দেন । চোখ খারাপ হলে সঙ্গে সঙ্গে চক্ষু-বিশেষজ্ঞদের কাছে যাওয়ার জন্য তাঁরা পরামর্শ দেন ।

সারা ভারতে অন্ধের সংখ্যা ৬০ লক্ষেরও বেশি । তবে একেবারে অন্ধ নয়, অথচ প্রায় অন্ধ এমন লোকের সংখ্যা ভারতে আনুমানিক তিন কোটি । পশ্চিমবঙ্গে অন্ধের সংখ্যা দু'লক্ষের উপর । এদের মধ্যে বসন্ত, অপুষ্টি, আঘাত, অপথ্যালমিয়া প্রভৃতির জন্য যাদের কর্নিয়া অস্বচ্ছ হয়ে গেছে তাদেরকে কর্নিয়া গ্রাফটিং-এর সাহায্যে অন্ধত্ব থেকে বাঁচানো যেতে পারে । কলকাতার নীলরতন সরকার এবং মেডিকেল কলেজে দুটি চক্ষু-ব্যাংক আছে । সম্প্রতি ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজে আই. ই. এফ-এর সহযোগিতায় আর একটি চক্ষু-ব্যাংক খোলা হয়েছে ।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের পরিচালনায় বিভিন্ন অঞ্চলে অন্ধত্ব নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর কাজ অনেকটা এগিয়েছে । রাজ্যের বিভিন্ন মেডিক্যাল কলেজের সঙ্গে এই কর্মসূচিকে যুক্ত করা হয়েছে । এখন পর্যন্ত ২৫০ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এই ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করা হয়েছে । এইসব মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোয় আসতে স্বাস্থ্যবিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন । ১৯৮৯-৯০ সালের মধ্যে রাজ্যে মোট ৫টি চক্ষুব্যাংক খোলার লক্ষ্য নির্দিষ্ট হয়েছে । কলকাতা, বর্ধমান, উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে চক্ষুবিভাগের ভ্রাম্যমাণ ইউনিট আছে । এছাড়া বাঁকুড়া ও পুরুলিয়াতেও ভ্রাম্যমাণ ইউনিটের সাহায্যে চক্ষু চিকিৎসার ব্যবস্থা চালু হয়েছে । ১৯৯০ সালের মধ্যে আরও

দুটি জেলায় ভ্রাম্যমাণ ইউনিট চালু হবার কথা আছে।

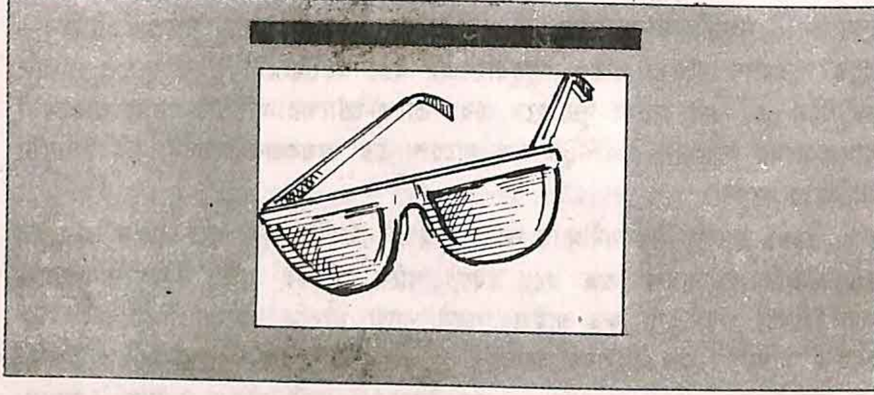
ভারতে এবং পৃথিবীর অনুন্নত দেশে দেখা যায় অন্ধত্বের মূলে আছে ছানি, অপুষ্টি এবং বসন্তরোগের আক্রমণ। অপুষ্টিজনিত অন্ধত্ব দেখা যায় শিশুদের মধ্যে বেশি। চোখের দৃষ্টিশক্তি ঠিক রাখতে হলে ভিটামিন-এ যুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা প্রয়োজন। সম্প্রতি জানা গেছে যে এক ধরনের টম্যাটো আছে যাতে ভিটামিন-এ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। সুতরাং এই ধরনের টম্যাটো গ্রহণ করতে পারলে ভিটামিন—এ এর অভাব দূর হবে এবং তাতে চোখের দৃষ্টিশক্তি ভাল থাকবে। বাঙ্গালোরের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটুট অফ সায়েন্স এর কয়েকজন বিজ্ঞানী এই টম্যাটো আবিষ্কার করেন।

১৯৮১ সালের এক সমীক্ষায় জানা যায় যে অপুষ্টির জন্য প্রতি বছরে ভারতের ৬০ হাজার ছেলেমেয়ে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। সেই অন্ধত্ব ঠেকাতে রয়্যাল কমনওয়েলথ সোসাইটি ফর ব্লাইণ্ড সজনে পাতা খাবার পরামর্শ দিয়েছেন। ঐ সংস্থার অধিকর্তা জন উইলসন বলেছেন যে, ভিটামিন— 'এ'-র অভাবজনিত অন্ধত্ব দূর করার জন্য প্রায় ২ কোটি ৬০ লক্ষ টাকার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে। সজনে পাতা হচ্ছে ভিটামিন-এ পূর্ণ খাদ্য। এই পাতা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। এই পাতা ছাড়া গাজরেও যথেষ্ট পরিমাণে ভিটামিন-এ থাকে।

অনেকের চোখ আবার ট্যারা দেখা যায়। এটি একটি গুরুতর রোগ বলা যেতে পারে। ট্যারা হবার প্রধান কারণ হচ্ছে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গোলযোগ এবং তাতে চক্ষু সঞ্চালনের নিয়ন্ত্রণকারী মাংসপেশী পরিচালনায় বাধা পায়। এর ফলে দুই চোখ দিয়ে দেখার কাজে বাধার সৃষ্টি হয়। ভারতের মোট শিশুর প্রায় দুই শতাংশ ট্যারা। চোখে দেখার মূলে আছে বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনায় অবস্থিত ফোবিয়ায় পড়া। কিন্তু ট্যারা চোখের ক্ষেত্রে বস্তুর প্রতিবিম্ব রেটিনার ফোবিয়াতে পড়ে না। সেটি পড়ে রেটিনার কোন এক পাশের জায়গায় এবং তখন দেখার বস্তু দুটি হয় এবং মস্তিষ্কের সাহায্যে এই অবস্থার অবসান ঘটে এবং তাতে চোখ ট্যারা মনে হয়। এই ট্যারা ব্যাপারটার হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায় যদি সময়মত চশমা নেওয়া যায়। বেশি বয়স হলে শল্যচিকিৎসার প্রয়োজন হয়। ট্যারা চোখের যে চিকিৎসা করা হয় তার একটি বিশেষ পদ্ধতির নাম অর্থো-অপটিকস্।

সুতরাং চোখ খারাপ হলে বা অন্ধ হলে আমাদের নিজেদের সজাগ থাকতে হবে। চক্ষু-বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে নিকটবর্তী চক্ষুব্যাংকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে হবে। অন্ধত্ব যা আমাদের কাছে এক বিরাট অভিশাপ তাকে মোকাবিলা করার জন্য সমগ্র মানবসমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। চক্ষু-ব্যাংকের বিশেষজ্ঞদের ডঃ জন এইচ কিং-এর আদর্শ মেনে সমাজের কাজে নিজেদের নিযুক্ত করতে হবে। সকলের সার্থক প্রচেষ্টায় অন্ধত্বের শিকার থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তি পাবে।

চোখ ও চশমা



চোখের সঙ্গে চশমার সম্পর্ক যে কত গভীর চশমা ব্যবহারকারীরা ভাল করেই তা বোঝেন। তালার সঙ্গে চাবির যে সম্পর্ক, চোখের সঙ্গে চশমার সম্পর্কও অনেকটা সেইরকম। চশমার প্রয়োজন শহরাঞ্চলের লোকেদের মধ্যেই বেশি। পৃথিবীর এক বিরাট সংখ্যক লোকের চোখেই চশমা দেখা যায়। শিক্ষকসমাজের লোকেদের মধ্যে চশমার প্রয়োজনীয়তা একটু বেশি বলেই মনে হয়। বৈদ্যুতিক আলোর মধ্যে বেশি সময় যাঁরা লেখালেখির কাজ করেন তাঁদের মধ্যে চোখ খারাপের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি। চোখের দৃষ্টি ক্ষীণ হলে, মানুষকে বাধ্য হয়েই তখন চশমা নিতে হয়।

চশমার প্রথম প্রচলন কখন শুরু হয়েছিল, তা বলা কঠিন। তবে যতদূর শোনা যায় খ্রিস্টপূর্ব ২৩০০ অব্দে চীনারা তাদের দৃষ্টিশক্তি বাড়াতে খনিজ কেলাস, পোখরাজ প্রভৃতি ব্যবহার করত। কিন্তু আজকের দিনে যে ধরনের লেন্সের সঙ্গে আমাদের পরিচয়, সেই ধরনের লেন্সের খবর তারা খ্রিস্টপূর্ব ৫০০ অব্দের আগে জানত না। তখন তারা যে সব কাচের লেন্স ব্যবহার করত তার উপকারিতা তারা ঠিক জানত না। অনেকে যেমন ভাগ্য ফিরবে বলে নানারকম মাদুলি, পাথর ব্যবহার করে, তারাও তখন ওই একই কারণে চশমা ব্যবহার করত।

প্রতি আবিষ্কারের পেছনে রয়েছে অজানাকে জানার আগ্রহ। তাই মানুষ তার চোখকে সাহায্য করার জন্য ব্যবহার করল এক ধরনের লেন্স। যাকে আমরা চশমা

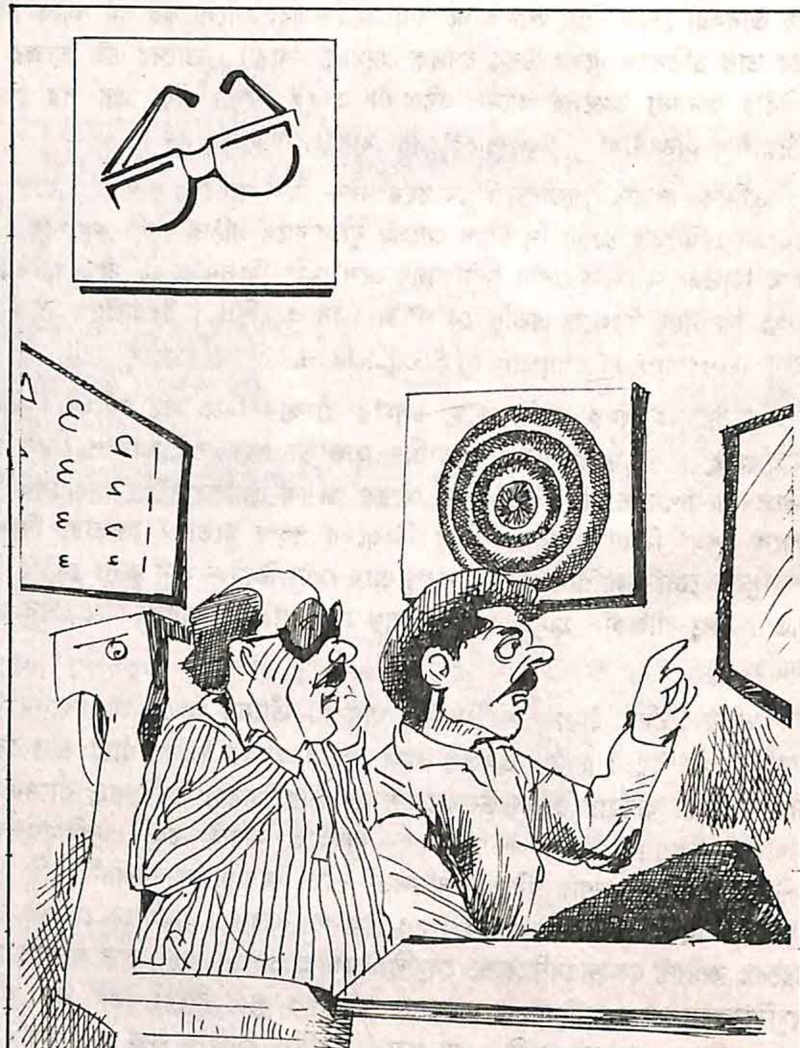
বলি। কিন্তু চশমা ব্যবহারের পেছনে মানুষের জ্ঞান কিভাবে কাজ করল ? শোনা যায় আরবরা চোখ নিয়ে অনেক গবেষণা করেন এবং আলোকের ধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ করে তার প্রতিসরণ গুণের উপর ব্যাপক অনুসন্ধান করেন। তাদের এই কাজের প্রতি পৃথিবীর অন্যান্য অঞ্চলের অনেক বিজ্ঞানী আকৃষ্ট হলেন এবং এর পর থেকেই ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা যুক্তিযুক্তভাবে লেন্স ব্যবহার শুরু করলেন।

এদিকে চশমার প্রয়োজনও বোধহয় দিন দিন বাড়তে লাগল। তাই সেই প্রয়োজন মেটাতেই ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে আগেই নুরেমবার্গে গঠিত হলো এক সংঘ। এই সংঘে বিভিন্নস্থান থেকে চশমা নির্মাতাগণ এসে যোগ দিতেন। এই সংঘ গঠনের পর ১৬২৯ খ্রিস্টাব্দে ইংলন্ডে একটি কোম্পানি গঠন হয়েছিল। ইংরাজীতে তার নাম হলো Worshipful Company of Spectacle Makers.

এরপর বহু বছর কেটে গেছে, চশমার ব্যবহার নিয়ে বহু পরীক্ষা নিরীক্ষাও হয়ে গেছে। ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন প্রথম বাইফোকাল লেন্স তৈরী করলেন। এখন অবশ্য এই লেন্সের আরও অনেক উন্নতি ঘটেছে। আগের দিনে লোকে চশমা কিনত দোকানে গিয়ে নিজেদের পছন্দ মতো। ক্রেতারা নিজেরাই চশমাগুলো চোখে লাগিয়ে পরীক্ষা করত আর যেটা উপযুক্ত মনে করত সেটাই কিনে নিত। কিন্তু আজকাল মানুষ ডাক্তার দিয়ে চোখ পরীক্ষা করিয়ে নিয়ে তবে চশমা নেন।

দূরের জিনিস যাঁরা ভাল দেখতে পান না তাঁদের ক্ষেত্রে যে ধরনের লেন্স ব্যবহার করা হয় তার নাম অবতল লেন্স। আর কাছের জিনিস যাঁরা ভাল দেখতে পান না তাঁরা ব্যবহার করেন উত্তল লেন্স। যাঁদের চোখের ত্রুটি কম, তাঁদের পক্ষে সাধারণ চশমার চেয়ে কণ্ট্যাক্ট লেন্স ব্যবহার করাই বেশি সুবিধাজনক। কণ্ট্যাক্টলেন্সের গবেষণায় বিশেষ সাফলতা লাভ করেছিলেন বিজ্ঞানী টুহি ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি কর্নিয়েল কণ্ট্যাক্ট লেন্স উদ্ভাবন করেন। বর্তমানে যে সব উন্নত ধরনের কণ্ট্যাক্ট লেন্স বেরিয়েছে, সেগুলি একটানা ১০-১২ ঘণ্টা পড়ে থাকতে কোন অসুবিধে হয় না। কণ্ট্যাক্ট লেন্স কাচ বা প্লাষ্টিক দুটো দিয়েই তৈরী করা যায়। তবে প্লাষ্টিকের প্রচলনই বেশি। যে ধরনের প্লাষ্টিক ব্যবহার করা হয় সেগুলি এক ধরনের পলিমিথাইল অ্যাক্রাইলেট যৌগ। আজকাল হাইড্রোফিলিক লেন্স ব্যবহার করা হয়। একে কোমল বা সফ্‌ট প্লাষ্টিক বলে। হাইড্রোফিলিক লেন্স এবং চোখের অচ্ছোদপটলের আলোকঘনত্ব মোটামুটি একইরকম হয়। এই লেন্স চোখের খুব কাছে থাকে বলে আলোর আপতিত রশ্মি ও প্রতিসৃত রশ্মি মোটামুটি একই সরলরেখায় থাকে এবং তাতে কোন বস্তুকে দেখতে দৃষ্টিভ্রম হয় না।

কণ্ট্যাক্ট লেন্স প্রধানত দু'প্রকার। (১) কর্নিয়াল (২) হেপটিক। এছাড়া আর এক ধরনের কণ্ট্যাক্ট লেন্স আছে যেগুলি কর্নিয়াল লেন্সের চেয়ে সামান্য একটু বড়,

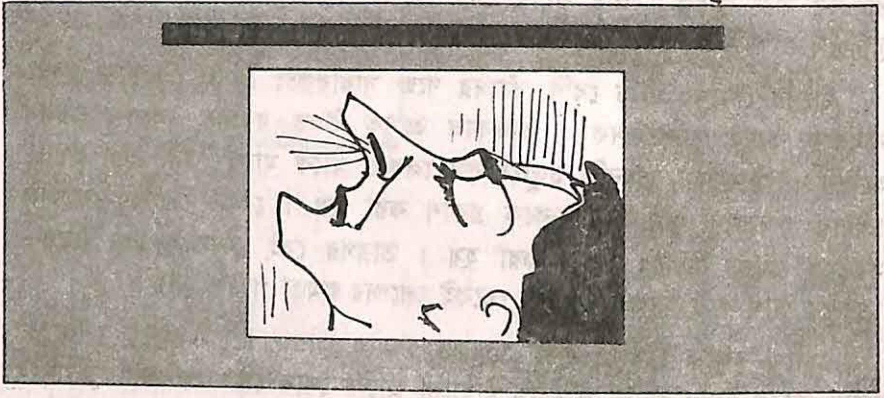


মাপের হয়। চোখে এই লেন্স ঠিকভাবে আটকে থাকার মূলে আছে পৃষ্ঠটানের প্রভাব। চোখের পাতাও এই কাজে সাহায্য করে। যে সব স্থানে ধোঁয়া, ধূলো বেশি থাকে, সেসব স্থানে থাকলে এই লেন্স চোখে অসুবিধের সৃষ্টি করে। বেশি উষ্ণপ্রধান অঞ্চলেও এই লেন্সের ব্যবহার অসুবিধের সৃষ্টি করে। এই লেন্স খুব সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। স্নান করার সময়, ঘুমোনোর সময় এই লেন্স খুলে রাখা উচিত।

যাঁদের চোখের ত্রুটি বেশি, তাঁদের পক্ষে সাধারণতঃ মোটা লেন্সযুক্ত চশমা ব্যবহার করাই সুবিধাজনক। আজকাল অনেক উন্নত ধরনের লেন্সের প্রচলন হয়েছে। ত্রিফোকস, এমনকি চতুঃফোকস লেন্সও মাঝে মাঝে তৈরী করা হয়। চশমার ক্ষমতাকে ডায়পটার এককে প্রকাশ করা হয়। কোন লেন্সের ফোকাল দূরত্বকে প্রথমে মিটারে প্রকাশ করা হয়। তারপর সেই ফোকাল মান দিয়ে– 'এক'কে ভাগ করে নিতে হয়। এর থেকেই লেন্সের ক্ষমতা পাওয়া যায়।

চোখে বস্তুকে ঠিকমত দেখা ছাড়াও চশমার আরও প্রয়োগ আছে। কালো চশমা পড়লে সূর্যের আলো ও চোখ ধাঁধানো আলো থেকে চোখ অনেকটা স্বস্তিবোধ করে। পাহাড়ে যাঁরা ওঠেন, মেরুতে যাঁরা যান, এমনকি মহাকাশে যাঁরা যান তাঁরা এমন ধরনের লেন্স ব্যবহার করেন যেগুলি অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করতে পারে। অবলোহিত রশ্মি রোধ করার জন্য বিভিন্ন চুল্লীর কাছে যাঁরা কাজ করেন, তাঁরা এমন লেন্স ব্যবহার করেন যাতে ঐ রশ্মি সহজেই রোধ করা যায়। দিনে দিনে বিজ্ঞানের অনেক উন্নতি হয়েছে। আলোক বিজ্ঞান আজ মানুষকে বহু অজানা তথ্য জানতে সাহায্য করছে। হেলমহোলৎসের নেত্রবীক্ষণ আজ মানুষের বহু উপকারে আসছে, কারণ এর দ্বারা মানুষের চোখের ভেতরের অংশ পরীক্ষা করা খুবই সহজ হয়েছে। ভাল ক্যামেরা তৈরী করা আজ আর কোন সমস্যাই নয়। তাই চশমা আজ আর মানুষের কাছে বোঝা নয় বরং বন্ধুস্বরূপ।

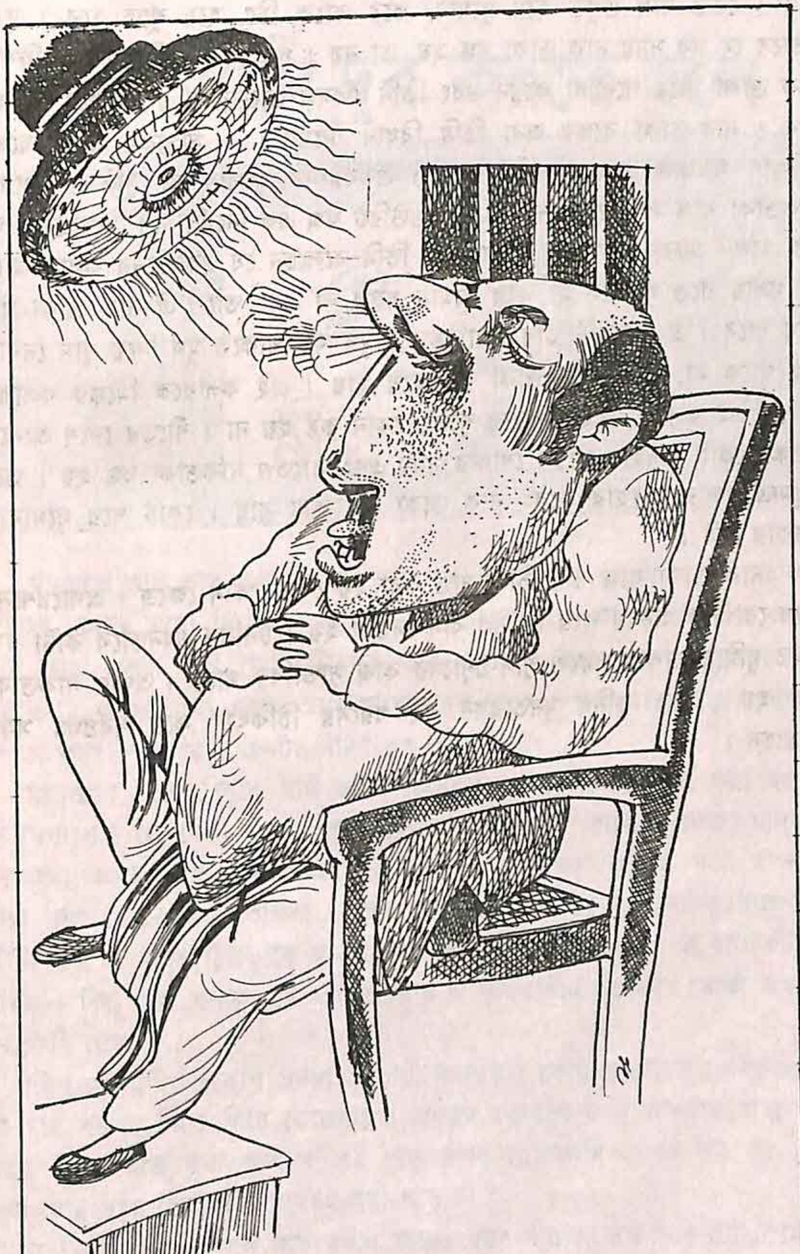
নাকডাকার দাওয়াই



কোন কোন লোক আছেন, যারা শুয়ে পড়লেই ঘুমিয়ে পড়েন এবং নাক ডাকা শুরু করেন। এই নাক ডাকার জন্য আপনি হয়ত ঘুমোতে পারছেন না, অথচ ঐ লোকটিকে যদি জাগিয়ে দেন তবে দেখবেন তাঁর নাক ডাকা বন্ধ হয়ে গেছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন, রাতে ঘুমের মধ্যে ফোঁস ফোঁস শব্দে শ্বাস ফেলা বা নেওয়া অথবা ফাঁস ফাঁস করে গলায় শ্বাসক্রিয়া, সবই একধরনের রোগ। নাক ডাকার কারণটি কি তা এবার জানা যাক।

মানুষ সাধারণ অবস্থায় নাক দিয়ে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ করেন। কিন্তু দেখা যায় ঘুমন্ত অবস্থায় কারও কারও ক্ষেত্রে এই নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কাজটা হয় মুখ দিয়ে। একজন মানুষ যখন জেগে থাকেন, তখন তাঁর মুখের ভেতরের তালু থাকে টানটান। কিন্তু ঘুমিয়ে পড়লে অনেকের ক্ষেত্রে এই টানটান ভাবটা আর থাকে না। এতে বায়ু মুখের ভেতর দিয়ে যাতায়াতের সময় তালুর চামড়া কাঁপিয়ে দেয়। ফলে নাক ডাকে। সর্দির জন্য নাকের কাজ যদি বাধা পায় তখন মুখ দিয়ে নাকের কাজ হয়ে থাকে এবং নাক ডাকে।

ঘুমিয়ে বিকট নাকডাকার জন্য বিখ্যাত হয়েছেন মেলসুইজার নামে লণ্ডনের এক ভদ্রলোক। ১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দে নাক ডাকা প্রতিযোগিতায় তিনি জাপানিদের হারিয়ে দিয়েছিলেন এবং শোনা যায় সেই সুবাদে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার তাঁকে এক ভোজে আপ্যায়নও করেছিলেন।



এখন নাক ডাকা বন্ধ করা যায় যদি শোওয়ার ধরনের অভ্যেসটা বদলান যায়। অর্থাৎ কেউ যদি ডান দিকে কাৎ হয়ে ঘুমোন তাঁকে বাঁদিকে কাৎ হয়ে শুতে হবে। কেউ যদি উপুড় হয়ে ঘুমোন, তবে তাকে চিৎ হয়ে শুতে হবে। তবে এভাবে যে সব সময় নাক ডাকা বন্ধ হয়, তা নয়। পূর্ব ফ্রেজীয় দ্বীপের ডাঃ ফিশার নাক ডাকা নিয়ে গবেষণা করেন এবং তিনি একদল ডাক্তারকে এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ দেন। নাক-ডাকা বন্ধের জন্য তিনি বিধান দিয়েছেন – স্বাস্থ্যকর খাদ্য, যথেষ্ট পরিমাণ ব্যায়াম এবং শ্বাসক্রিয়ার জন্য একধরনের মুখোশ বা ঠুলি। সম্প্রতি নাকডাকা বন্ধে লস্ এঞ্জেলসের ডঃ জে ডিউরিট ফক্স এক নির্দেশলিপি দিয়েছেন। ডঃ ফক্স হলেন একজন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ। তিনি বলেছেন যে একধরনের কলার আছে যা গলায় পড়ে ঘুমোলে হাঁ করে ঘুমোন যাবে না এবং তাতে ঐ নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে। ঐ কলারটি তাঁরই আবিষ্কৃত। মুখ বন্ধ থাকলে মুখ দিয়ে শ্বাস নেবার প্রশ্ন থাকে না, ফলে নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যায়। এই কলারকে মিঙ্কের কলারও বলে। এই কলার ব্যবহার করলে শুতেও কোন কষ্ট হয় না। শীতের দেশে অনেকে মিঙ্কের কোট ব্যবহার করেন শোবার সময় এবং তাতেও নাকডাকা বন্ধ হয়। তবে শুধুমাত্র কলার ব্যবহার করেই নাক ডাকা বন্ধ করা যায়। কোট পরে ঘুমোবার দরকার নেই।

নাক ডাকা বন্ধে শল্য চিকিৎসাও করা হয় কোন কোন ক্ষেত্রে। অপারেশনের সময় রোগীকে অজ্ঞান করে টনসিল বাদ দেওয়া হয়। টনসিল এমনভাবে কাটা হয়, যাতে ঘুমিয়ে থাকার সময়ও শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজ স্বাভাবিক থাকে। অর্থাৎ নাকডাকা বন্ধ হয়। ডাঃ কনিথ মুনতারবন এই ধরনের চিকিৎসা করে সর্বপ্রথম সফল হয়েছেন।

তোতলামি দূর করতে হলে



মানুষকে তার ভাব প্রকাশ করার জন্য কথা বলতে হয়। ভাষাটা যাই হোক না কেন, কথার মধ্যে দিয়ে একজন তার মনোভাব অন্যের কাছে জানায়। কথা বলার কাজ একটি শিশু মোটামুটিভাবে তার একবছর বয়স থেকে শুরু করে। ছোটবেলার কথার মধ্যে একটা আধোআধো ভাব থাকে। পরে বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা ক্রমশ স্পষ্ট হয় ও একটা নির্দিষ্ট রূপ লাভ করে।

মাতৃভাষা ছাড়া শিশুকে যদি আরও কয়েকটি ভাষা শিখতে বাধ্য করা হয়, তবে দেখা যায় যে, কোন কোন শিশুর মধ্যে তোতলামি এসে যাচ্ছে। একজন মানুষ যখন কথা বলার সময় বারবার হোঁচট খায় অর্থাৎ আমতা আমতা করে তখন আমরা বলি যে লোকটি তোতলা। তবে সাময়িক কোন রোগ, মানসিক চাঞ্চল্য প্রভৃতির জন্য ও মানুষ ঠিকভাবে অনেক সময় কথা বলতে পারে না। এ ব্যাপারটা সাময়িক। কিন্তু কথা বলার ত্রুটি যদি বারবার ও দীর্ঘকালীন হয় তবে বোঝা যায় যে ব্যক্তিটি তোতলা।

এই তোতলামির প্রকোপ অবস্থা অনুযায়ী বদলায়। কোন স্বাভাবিক লোককেও **দেখা** যায় বক্তৃতা দিতে গিয়ে তোতলায়। একজন তোতলা যখন আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজে নিজে কথা বলে বা বই পড়ে তখন তোতলামি অনেক কম হয়। গান-গাওয়ার সময় তোতলামি মোটেই ধরা পড়ে না।

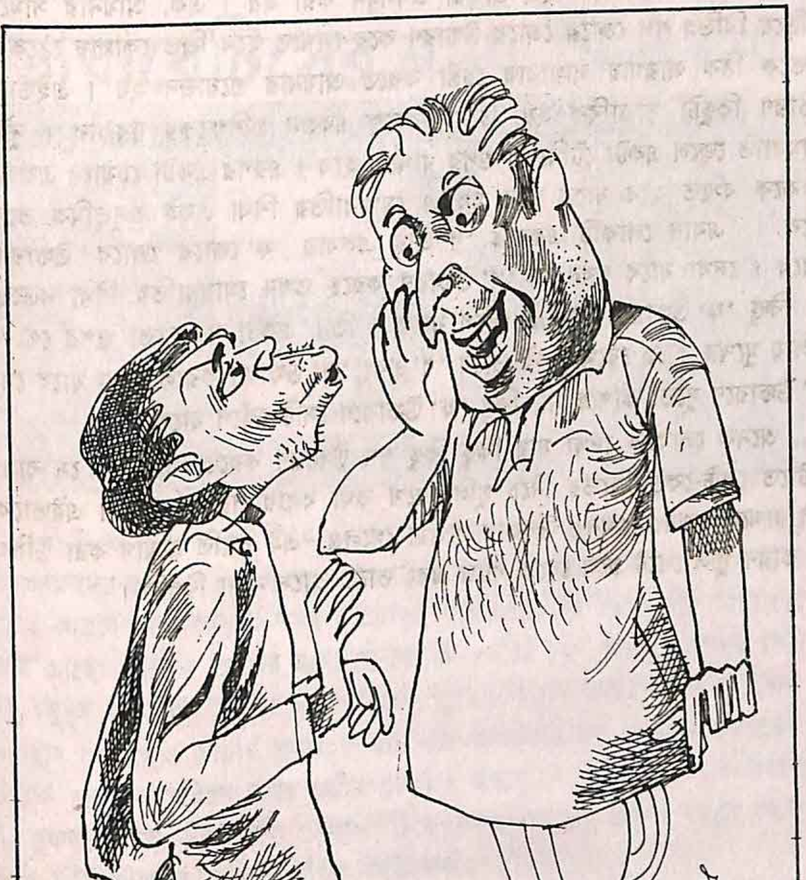
তোতলামি বয়সের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এটি কমে

আসে । তোতলামি যাদের হয় তাদের তা ছোটবেলাতেই হয় । বেশি বয়সে তোতলামির ঘটনা প্রায় নেই বললেই চলে । অতিরিক্ত আদর, অতিরিক্ত শাসন এসবের জন্যও তোতলামি দেখা দেয় । যাঁরা ন্যাটা –অর্থাৎ যাঁরা বাঁহাতকে লেখা, খেলা বা অন্যকাজে ব্যবহার করেন, তাঁদের ক্ষেত্রেও তোতলামিটা ডানহাতির মতই থাকে, তবে বাঁহাতিকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ডানহাতি করতে চাইলে অনেক সময় তোতলামি দেখা যায় ।

কথা বলার ব্যাপারটা হচ্ছে একরকম স্নায়বিক-মানসিক কলাকৌশল যা বিভিন্ন কারণে বাধা পড়ে । সুতরাং যে সব কাজে স্নায়ু দুর্বল হয়, সে সব কাজ একজনকে তোতলা করে দিতে পারে । অনেকে আবার অনুকরণ করতে করতে তোতলা হয়ে যায় । একজন তোতলা যখন কথা বলতে গিয়ে আটকে যায় তখন তার ঠোঁট কাঁপতে থাকে, হাত-পা অস্থির হয়ে ওঠে । এতে তার আড়ষ্ঠতা আরও বেড়ে যায় । তোতলাদের অনেকে হীনমন্যতায় ভোগে । সেজন্য অনেক মানসিক রোগীকেও তোতলামি করতে দেখা যায় । তোতলামি থাকলে একজন মানুষের ব্যক্তিত্ব ফুটে উঠতে অনেকাংশে বাধা পায় । অনেকে তোতলামির সঙ্গে নাকিসুরেও কথা বলে । এতে বোঝা যায় যে বক্তা তার বক্তব্য সমৃদ্ধে খুব জোরদার নয় ।

এছাড়া বাংলায় তোতলামি বলতে যা বোঝায়, ইংরাজীতে তাকে দু'রকমভাবে ভাগ করা হয়েছে । এক হল স্ট্যাটারিং, এতে কোন শব্দ বা কথা বারবার বলা বা কথা বলার সঙ্গে এক এক স্থানে আটকে যাওয়াকে বোঝায় । আর অন্য ধরনটিকে ইংরাজীতে বলে স্টামারিং । এটি হলো কোন শব্দ বা কথাকে বিকৃতভাবে উচ্চারণ করে তা প্রকাশ করা । ডাক্তারিভাষায় এর নাম আর্টিকুলেশন ডিসঅর্ডার । বিকৃত উচ্চারণের ফলে অনেকে 'কল' কে 'কণ', শ্মশানকে ছছান বলেন ।

শিশুদের তোতলামি দূর করতে হলে তাদেরকে সবকাজে উৎসাহ দিতে হবে । তাদের অত্যধিক আদর দেওয়া বা অত্যধিক শাসনের মধ্যে রাখা চলবে না । শিশু যাতে সহজে উচ্চারণ শিখতে পারে ও তার কথার মধ্যে আড়ষ্টতা না থাকে সেজন্য এক ধরনের উপায় ব্রিটেনে বিজ্ঞানীরা বার করেছেন । এই প্রক্রিয়ায় শিশুর মুখের ভেতর তার তালুর মাপে একটি কৃত্রিম তালু লাগান হয় এবং চিকিৎসক নিজেও একটি কৃত্রিম তালু ব্যবহার করেন । প্লাস্টিকের তৈরি কৃত্রিম তালুর ওপর ছোট ছোট ইলেকট্রোড বা তড়িৎদ্বার লাগান থাকে । মুখের কৃত্রিম তালুর সঙ্গে ইলেকট্রোডের পাশে রাখা একটি বোর্ডের সঙ্গে বৈদ্যুতিক যোগাযোগ করা থাকে । চিকিৎসক একটি শব্দ যখন উচ্চারণ করেন তখন বোর্ডের কাছে রাখা একটি পর্দায় আলো জ্বলে ওঠে । এরপর শিশুটিকে ঐ শব্দ বারবার উচ্চারণ করিয়ে যখন দেখা যায় যে সেইসব স্থানে আলো জ্বলে উঠছে তখন দেখা যায় যে শিশু শব্দগুলি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করছে । এইভাবে সঠিক উচ্চারণের মাধ্যমে শিশুর কথা পরিষ্কার হয় ও

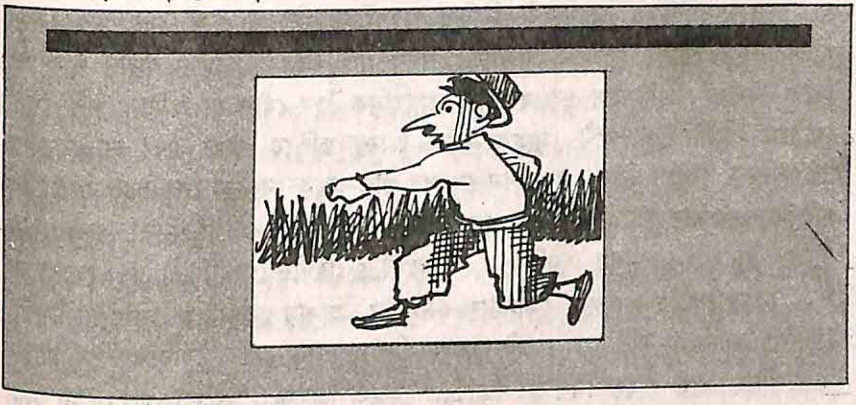


আড়ষ্টতা চলে যায়।

উচ্চারণ ঠিকভাবে যাতে করান যায় এজন্য স্পিচ থেরাপি করা যেতে পারে। এই থেরাপিতে কয়েকটি সহজ প্রক্রিয়া অবলম্বন করা হয়। এক, আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বিভিন্ন শব্দ জোরে জোরে উচ্চারণ করে দেখতে হবে জিভ কোথায় ঠেকে। জিভকে ঠিক জায়গায় লাগাবার চেষ্টা করতে আয়নার প্রয়োজন হয়। এইভাবে উচ্চারণ কিছুটা স্বাভাবিক হয়, তবে একাজে একজন প্রশিক্ষকের দরকার। দুই, মোমবাতি জ্বেলে একটা টেবিলের ওপর রাখতে হবে। এরপর একটা চেয়ারে একজন লোককে বসতে হবে যাতে তার মুখ ও মোমবাতির শিখা একই অনুভূমিক তলে থাকে। এবার লোকটি একবার 'প' আর একবার 'ফ' জোরে জোরে উচ্চারণ করবে। দেখা যাবে যখন সে 'প' উচ্চারণ করছে তখন মোমবাতির শিখা নড়ছে না, কিন্তু 'ফ' উচ্চারণে শিখাটি কেঁপে যাচ্ছে। তিন, একটা সরু সুতো ওপর থেকে ঝুলিয়ে মুখের কাছে রেখে একই ভাবে 'প' এবং 'ফ' উচ্চারণ করলে দেখা যাবে যে 'প' উচ্চারণে সুতো কাঁপছে না, কিন্তু 'ফ' উচ্চারণে সেটি কেঁপে যাচ্ছে।

অনেক লোককে দেখা যায় কিছু কিছু শব্দ উচ্চারণ করতে পারে না। সে বাধা কাটাতে কেউ-কেউ জিভের নিচে গুলি রেখে কথা বলার পরামর্শ দেন। এইভাবে গুলি রাখলে কখনও কখনও উপকার পাওয়া গেলেও,–এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা উচিৎ নয় কারণ গুলি পেটে চলে যেতে পারে এবং তাতে আসে নানা বিপত্তি।

ডায়াবেটিসের নানা চিকিৎসা



প্রতিটি মানুষ চায় সুস্থ দেহ নিয়ে বেঁচে থাকতে, কিন্তু বিভিন্ন কারণে নানা রোগ আমাদের আঁকড়ে ধরে থাকে। অত্যাধিক মানসিক পরিশ্রম, মানসিক অশান্তি ও বংশগত কারণে রোগ আসতে পারে। এছাড়া বিভিন্ন জীবাণুঘটিত কারণে রোগ তো লেগেই আছে। নানান রোগের মধ্যে যে রোগটা সমাজে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে সেটি হলো বহুমূত্র বা ডায়াবেটিস। চরকসংহিতা শুশ্রুতসংহিতায় বহুমূত্র রোগ 'মধুমেহ' নামে স্থান পেয়েছে। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর আত্মচরিতের একস্থানে লিখেছেন, অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম অথচ শরীর চালনার অভাব – ইহারই ফলে কেশবচন্দ্র সেন, কৃষ্ণদাস পাল, বিচারপতি তেলাঙ্গ, বিবেকানন্দ, গোখেল প্রভৃতি বহুমূত্র রোগে আক্রান্ত হইয়া অকালে মৃত্যুপথে পতিত হইয়াছেন।

এই রোগটা কি তা এবার জানা যাক। সাধারণত সুস্থ অবস্থায় শর্করা রক্তে থাকার একটা গড় মান আছে এবং তা হলো প্রতি ১০০ মিলিলিটারে ৮০ থেকে ১২০ মিলিগ্রাম। রক্তে শর্করার এই ভারসাম্য বজায় না থাকলে ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র রোগ দেখা দেয়। এর সঙ্গে সঙ্গে রক্তে ট্রাইগ্লিসারাইড ও কোলেস্টরালের পরিমাণও বেড়ে যায়। মূত্রে মাছি, পিঁপড়ে বসতে দেখলেই এ রোগ সম্বন্ধে সতর্ক হতে হবে। এ রোগে ঘন ঘন জল পিপাসা, ঘন প্রস্রাবের বেগ, মুখে মিষ্টিস্বাদ অনুভব, অনেক সময় শরীরে চুলকানি, মাথাঘোরা, দুর্বলতা, মূর্ছা প্রভৃতি দেখা যায়। অন্য কোন কারণে ও যকৃতকোষ থেকে চিনি মূত্রাশয়ে আসে এবং প্রস্রাবের সঙ্গে বেরোয়। এই রোগের নাম বহুমূত্র নয়, এর নাম রেনাল গ্লাইকোসুরিয়া। এই রোগ নিরাময়ের জন্য

জার্মানীতে ১৯৫৫ সালে টলবুটামাইড নামে ওষুধ প্রস্তুত করা হয়। বর্তমানে ইনসুলিন ইনজেকশন দিয়ে এর চিকিৎসা করা হয়, তবে অনেকক্ষেত্রে নানা ধরনের ট্যাবলেটও ব্যবহার করা হয়। এখন যেহেতু ইনসুলিন এই রোগের অন্যতম ফলপ্রসু ওষুধ সেই কারণে বলা যেতে পারে এর অভাবই বহুমূত্র রোগের অন্যতম প্রধান কারণ। আমাদের অগ্ন্যাশয়ের কোষগুলি বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং সেই সব কোষে পলিপেটাইড হর্মোন প্রোটিন জাতীয় যৌগের সৃষ্টি করে। হর্মোন শব্দটি গ্রীক শব্দ থেকে এসেছে। এটি হল এক ধরনের রাসায়নিক জৈব যৌগ যা অন্যান্য গ্রন্থি থেকে বেরিয়ে নালীবিহীন পথে দেহের নানা অংশে ছড়িয়ে পড়ে এবং শারীরবৃত্তীয় কাজগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করে। হরমোন যে সব গ্রন্থি থেকে বেরোয় সেগুলিকে এণ্ডোক্রিন গ্রন্থি বলে। মানবদেহের সাতটি এরূপ গ্রন্থির নাম হল – পিটুইটারী, থাইরয়েড, প্যারাথাইরয়েড, অগ্ন্যাশয়, অ্যাড্রিনাল, পাকস্থলী ও গ্রহণীর শ্লেষ্মাঝিল্লী এবং গোনাড।

কোন কোষে গ্লুকাগন, কোনটায় ইনসুলিন, আবার কোনটায় সোমাটোস্ট্যাটিন (Somatostatin) সৃষ্টি হয়। এই সব হর্মোন অগ্ন্যাশয় থেকে বেরিয়ে এসে রক্তের সঙ্গে মিশে যায় এবং বিপাক পদ্ধতিতে কাজে আসে। এদের মধ্যে ইনসুলিন সবথেকে বেশি প্রয়োজনীয়। কয়েকবছর আগে ডঃ স্ট্যাইলার, ডঃ চ্যান্স ও তাঁদের সহকর্মীরা মিলে মানুষ ও গরুর অগ্ন্যাশয়ে একটি যৌগ আবিষ্কার করেন এবং তার নাম দেন প্রো-ইনসুলিন। এর থেকেই ইনসুলিনের সৃষ্টি। প্রতিটি প্রোইনসুলিন অণু থেকে সম পরিমাণ অণুর ইনসুলিন ও সংযোজক পেপটাইড পাওয়া যায়। এছাড়া কয়েকটি অ্যামিনো অ্যাসিডও পাওয়া যায়। ইনসুলিন অণুর সঙ্গে দস্তার আয়ন যুক্ত হয় ও দানার আকার ধারণ করে। এই ইনসুলিনদানা ও বিভিন্ন পেপ্টাইড অগ্ন্যাশয় থেকে বেরিয়ে রক্তের মাধ্যমে যকৃতে যায়। ইনসুলিন উৎপাদনের উপর সংযোজক পেপটাইড উৎপাদনের হারও নির্ভর করে ডায়াবেটিক রোগীর ইনসুলিনের ভারসাম্য যেমন নষ্ট হয়,তেমনি নষ্ট হয় অন্যান্য পলিপেপটাইডগুলির ভারসাম্যও।

অগ্ন্যাশয় গ্রন্থির ভেতর বিক্ষিপ্তভাবে অনেকগুলি কোষ দেখা যায়। এতে আবার আলফা ও বিটা নামে দু'ধরনের কোষ থাকে। বিটা থেকেই উৎপন্ন হয় – ইনসুলিন হরমোন। আমরা জানি, গ্লুকোজ ও গ্লাইকোজেন এই দুটোই কার্বহাইড্রেট এবং গ্লুকোজে থাকে সরল শর্করার একটি একক এবং সেক্ষেত্রে গ্লাইকোজেনে থাকে অনেকগুলি একক। কোষ বা প্রোটোপ্লাজম সরাসরি গ্লুকোজ শোষণ করতে পারে। এবং আগেই বলা হয়েছে যে মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় প্রতি ১০০ মিলিলিটার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ ৮০ থেকে ১২০ মিলিগ্রাম। গ্লুকোজের দহন থেকে যে শক্তি পাওয়া যায় তাই আমাদের কর্মশক্তি যোগায়। ইনসুলিন যকৃৎ ও পেশিতে গ্লুকোজের দহন ঘটায়। এখন প্রোটিন জাতীয় খাদ্য থেকে গ্লুকোজ তৈরিতে কোন বাধা না থাকায় রক্তে শর্করার পরিমাণ উপযুক্ত মানের বেশি হয়ে যায় এবং তা মূত্রের সঙ্গে বা

ঘামের সঙ্গে দেহ থেকে বেরিয়ে আসে। এতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে। এইভাবেই মধুমেহ রোগ দেখা দেয়। বর্তমানে কৃত্রিমভাবে ইনসুলিন তৈরি করা সম্ভব হয়েছে এবং এই ইনজেকশন দিয়ে রোগটি ঠেকান সম্ভব হয়েছে।

আমাদের অগ্ন্যাশয়ে এক বিশেষ ধরণের কোষ আছে। সেগুলিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একটির নাম আলফা, অপরটি বিটা। এই বিটা কোষ ইনসুলিন উৎপাদন করে। অগ্ন্যাশয় থেকে ইনসুলিন বেরিয়ে রক্তে চলে যায় এবং দেহে কার্বহাইড্রেট (বা শ্বেতসার) জাতীয় খাদ্যের বিপাক নিয়ন্ত্রণ করে। শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য অন্ত্রে শর্করায় পরিণত হয় কিন্তু রক্ত থেকে শর্করার দেহকোষে যাওয়া এবং তার দহন ইনসুলিন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। ইনসুলিনের পরিমাণ কম হলে শর্করা কোষে প্রবেশ করে। ঠিকমত শক্তি উৎপন্ন করতে পারে না। এতে রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে যায় এবং বিপাক ক্রিয়া বাধা পায় এবং সেই অবস্থাকে ডায়াবেটিস বা বহুমূত্র বলা হয়। যখন রক্তে শর্করার পরিমাণ বেড়ে একটা নির্দিষ্ট মানের ওপর চলে যায় অর্থাৎ ১০০ মিলিলিটারে ১৮০ মিলিগ্রামের বেশি হয়, তখন আর শর্করা রক্তে ফিরতে পারে না এবং তা প্রস্রাবে বেরিয়ে আসে। রেচন নালিতে শর্করার পরিমাণ বাড়লে তার সঙ্গে বাড়তি জলও জমতে থাকে এবং তাতে বৃক্কে প্রস্রাবের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং রোগী বারবার প্রস্রাব করে। এই প্রস্রাবের সঙ্গে শরীর থেকে প্রয়োজনীয় লবণ ও জল বেরিয়ে যায় এবং রোগী দুর্বল হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় রোগীকে জল ও প্রয়োজনীয় লবণ খেতে হবে নইলে শরীরে নানা রোগ দেখা দিতে পারে। নানা রোগের মধ্যে স্নায়ুতন্ত্র, বৃক্ক ও চোখের রোগই বেশি দেখা দেয়।

ইনসুলিনের অভাব ছাড়া কোন কোন ভাইরাসের আক্রমণে লিভারে অসুখ এবং অত্যধিক ওষুধ সেবনের ফলেও এই রোগ হতে পারে। বংশগত কারণেও এই রোগ হতে পারে। মা ও বাবা দুজনেই এই রোগে আক্রান্ত থাকলে তাদের সন্তানদের এই রোগের কবলে পড়ার সম্ভাবনা খুব বেশি। অল্পবয়সে এই রোগ খুব একটা হয় না এবং এর প্রকোপ দেখা দেয় ৫০ বছরের কাছাকাছি বয়স থেকেই। মেদযুক্ত শরীর যাদের তাদের এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কিছুটা বেশি। অগ্নাশয়ের রোগে এটা হতে পারে।

গত ১৯৭৮ সালে ক্যালিফোর্নিয়ার চারজন বিজ্ঞানী কৃত্রিম উপায়ে যে ইনসুলিন আবিষ্কার করেছেন, তা মানুষের প্যাংক্রিয়াস থেকে যে ইনসুলিন পাওয়া যায় তার সঙ্গে সম্পূর্ণ এক। এই চারজন বিজ্ঞানী হলেন ডেভিড গোয়েডেল, আর্থার রিগস, কেইচি ই টাকুরা এবং রবার্টো ক্রেয়া। বাজারে দু ধরনের ইনসুলিন পাওয়া যায়। একটির নাম পর্ক এবং অপরটির নাম বীফ। এই ইনসুলিন গবাদি পশু ও শূকরের প্যাংক্রিয়াস থেকে সংগ্রহ করা হয়। তবে এ কাজে অনেক অসুবিধা আছে। ক্যালিফোর্নিয়ায় যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা থেকে বড় আকারে ইনসুলিন পাবার

আশা করা যায়। তাঁরা যে সব জিন-ইনসুলিন তৈরি করেছেন সেগুলি ই-কোলাই জীবাণুনামে প্রবেশ করান। এই জীবাণুগুলিই ইনসুলিনের সরবরাহ করে। বহুমূত্র রোগীর জীবন স্বাভাবিকভাবে চলতে পারে না, কারণ তাকে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে সব সময় একটা নিয়ম মেনে চলতে হয়। খাদ্যে নিয়ন্ত্রণ না থাকলে রোগী ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। এই রোগে আক্রান্ত হলে স্নেহজাত পদার্থ, শর্করা ও প্রোটিন এই তিন ধরনের খাদ্যের বিপাকেই বাধা সৃষ্টি হয়। ফলে শরীর সুস্থ রাখা কঠিন হয়ে পড়ে। এই রোগে আক্রান্ত হলে অন্যান্য রোগও সহজে প্রবেশ করার সুযোগ পায়। এর থেকে অনেকেই নানা রোগ যেমন দৃষ্টিহীনতা, কোষ্টবদ্ধতা, পক্ষাঘাত, হৃদরোগ প্রভৃতির শিকার হন। বিপাকের বিঘ্ন ঘটলেও মানুষ নানা রোগের কবলে পড়ে। বহুমূত্র রোগীর ক্ষেত্রে শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য যেমন আটা, ময়দা, ভাত, আলু, চিনি, প্রভৃতি বেশিমাত্রায় খাওয়া চলবে না। কম পরিমাণে একবেলা ভাত বা রুটি খাওয়া যেতে পারে। ভাতের সাথে শাক খেলেও চলবে। এর সঙ্গে মাছ, মাংস, ডিম, সুজির রুটি, ঘোল খাওয়া যেতে পারে। মিষ্টি, চা, কফি, মদ পান প্রভৃতি এই রোগে বাদ দিতে পারলেই ভালো। এই রোগে রোগী হঠাৎ খুব একটা মারা যায় না বরং দীর্ঘদিন ভুগে ধীরে ধীরে মারা যায়। রাজস্থান বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন গবেষক পরীক্ষা করে দেখেছেন যে গুয়ারগাম নামে এক ধরনের পদার্থ রক্তে শর্করার পরিমাণ কমাতে পারে। তাঁরা এই গুয়ারগাম দিয়ে পাঁউরুটির মত রুটি তৈরির কথা বলেছেন, যা ভাত বা রুটির বদলে খাওয়া যেতে পারে। ডায়াবেটিক কুকুরের ওপর পরীক্ষা করে দেখা গেছে ২০ গ্রাম গুয়ারগাম খাওয়ালে রক্তে শর্করার পরিমাণ ৪৫ শতাংশের মত কমে যায়। এতে গ্লুকোজ পরিপাক করার ক্ষমতা বেড়ে যায়। ওপরের এই পরীক্ষাটি করেন ডাঃ ভি পি রক্ষিত এবং ডাঃ আর কে গুপ্ত।

পরীক্ষায় দেখা গেছে, চালে থাকে শতকরা ৭৮ ভাগ শর্করা ও ৮ ভাগ প্রোটিন, আর আটায় ৭৪ ভাগ শর্করা ও ১২ ভাগ প্রোটিন। অতএব চাল ও আটায় শর্করার পরিমাণে ব্যবধান খুব কম। সেজন্য বহুমূত্র রোগীরা ভাত বা রুটি যে কোন একটিই খেতে পারেন। তবে পরিমাণে যেন খুব বেশি না হয়। ভাত বা রুটি খাওয়াটা আবার নির্ভর করে রোগীর অন্যান্য দিকগুলো যেমন বয়স, ওজন, রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণের ওপর। তবে ভাতের বদলে রুটি খেলে রক্তে গ্লুকোজ অপেক্ষাকৃত ধীরে ধীরে বাড়ে। একজন ডায়াবেটিক রোগীকে দিনে সাধারণত ১৫০ থেকে ১৬০ গ্রাম মত কার্বহাইড্রেট খেতে দেওয়া হয় এবং তা পাওয়া যায় ২২৫ গ্রাম চাল বা আটা থেকে। চালের থেকে আটায় ফাইবার বেশি থাকে। সেজন্য আটার রুটি খাওয়া তুলনামূলকভাবে ভাল। তবে ভাতের সঙ্গে শাকপাতা খেলেও রুটির পরিমাণ ফাইবার ভাত ও শাকসবজী থেকেও পাওয়া সম্ভব। শাক থেকে রোগী নানারকম ভিটামিন বিশেষ করে কেরোটিন পেতে পারে। সুতরাং রুটির বদলে


নলেন গুড়ের সন্দেশ

ভাত ও শাক খাওয়া যেতে পারে । অনেক ডায়াবেটিক রোগী মধু খেয়ে থাকেন, কিন্তু তাতে রক্তে গ্লুকোজের মাত্রা বেড়ে যায়, সুতরাং মধু খাওয়া ঠিক নয় ।

ডায়াবেটিক রোগী যদি চিনি বা চিনিজাত খাদ্য যেমন সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতি খান, তখন তার রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং তা দহন করার মত প্রয়োজনীয় ইনসুলিন না থাকায় রক্তের গ্লুকোজ বেরিয়ে আসে । প্রস্রাব পরীক্ষা করে গ্লুকোজের মাত্রা জেনে নেওয়া যায় । বর্তমানে চিনির বদলে অনেকে স্যাকারিন ব্যবহার করে থাকেন এবং এটি চিনির থেকে প্রায় ৫০০ গুণ বেশি মিষ্টি । তবে অনেকে আশঙ্কা করছেন যে স্যাকারিনের সঙ্গে ক্যানসারের সম্পর্ক আছে । ফুড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন আমেরিকায় কয়েক বছর আগে এর ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছিল । এ আদেশ অবশ্য পরে তুলে নেওয়া হয়েছে । জাপানেও স্যাকারিন উৎপাদন করা হত খুব বেশি পরিমাণে কিন্তু এর ব্যবহার এখন সেখানে নিষিদ্ধ হয়েছে । স্যাকারিনের পরিবর্তে অনেক খাদ্যে আজকাল ফ্রুকটোজ, জাইলিটল ও সরবিটল ব্যবহার করা হচ্ছে । চিনির থেকে ফ্রুকটোজ শতকরা ৭৫ ভাগ মিষ্টি এবং এটি খেলে রক্তে গ্লুকোজ ধীরে ধীরে বাড়ে । অথচ চিনি বা গ্লুকোজ খেলে রক্তে তা খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে । জাইলিটল রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ খুব একটা বাড়ায় না তবে নানা উপসর্গের সৃষ্টিকারক বলে এটি বেশি ব্যবহার করা হয় না । যদিও সরবিটল অনেক রোগীকে খাওয়ান হয় তবে তা প্রথমে যকৃতে ফ্রুকটোজে পরিণত হয় এবং পরে গ্লুকোজে পরিণত হয় । সুতরাং এটি না খাওয়াই ভাল । এই রোগের চিকিৎসার নানান পদ্ধতি আছে এবং সেগুলি একে একে আলোচনা করা যাক ।

অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় ইনসুলিন ইনজেকশান ব্যবহার করা হয় । খাদ্য নিয়ন্ত্রণ এবং নানা ট্যাবলেটের প্রয়োগ করেও এর চিকিৎসা করা হয় । সালফোন ইউরিয়া জাতীয় ওষুধ এতে ব্যবহার করা হয় । সম্প্রতি মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজের ডাক্তার এন. এস. ভ্যাস এই রোগের একটি ভাল ওষুধ বার করেছেন । বিজাসার নামে এক গাছের কোর উড থেকে তৈরি গামলাতে এক রাত জল রেখে সেটা ক্রমাগত ৪৫ দিন পান করলে এই রোগ নাকি সারে । ল্যাটিনে গাছটির নাম হচ্ছে টেরোকারপাস মারসুপিয়েম । এই রোগে জ্যাম, জেলি, চকলেট, কেক, মিষ্টি, বিস্কুট প্রভৃতি খাওয়া ত্যাগ করতে হবে হবে এবং ভাত, রুটি ডাল দুধ ফল প্রভৃতি পরিমাণমত খেতে হবে । মাছ, মাংস, ডিম, শাকসবজী, ও স্যাকারিনের চা, কফি (চিনি ছাড়), নুন খাওয়া যেতে পারে । কয়লার রস খাওয়া যেতে পারে কারণ এতে কার্বহাইড্রেট থাকে না তবে এটি যে এইরোগের ওষুধ তা কিন্তু মোটেই নয় । অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসায় ডাক্তাররা রোগীকে অনেক সময় ডায়াবিনেজ ট্যাবলেট খেতে দেন । প্রত্যহ প্রধান আহারের পর একটি ট্যাবলেট খেতে হয় এবং সেইসঙ্গে একটি করে ভিটামিন-এ ট্যাবলেট খাওয়া যেতে পারে ।

আর্য়ুবেদীয় চিকিৎসায় দেশীয় নানা পাতার রস সেবন ও খাওয়ার নিয়ম মেনে চলার কথা বলা হয়। নয়ন-তারা, করলা, তেলাকুচো প্রভৃতি খেয়ে বহুলোক উপকার পেয়ে থাকেন। এইসব পাতার নির্যাস ইঁদুরে ইনজেকশান করে দেখা গেছে রক্তে শর্করার পরিমাণ কমে।

হোমিওপ্যাথিতে মূত্রের শর্করা কমাতে রোগীকে সিজিয়াম জাম্বোলেনাম ওষুধটি পরিমাণমত দেওয়া হয়। এছাড়া কোন কোন ক্ষেত্রে ন্যাট্রাম সালফ এবং ন্যাট্রামফস ওষুধ দুটির একটি সকালে এবং অন্যটি বিকেলে নিয়মিত খেলে উপকার পাওয়া যায়।

আজকাল নানারকম ব্যায়াম বা আসন করে নানা রোগের চিকিৎসা করা হয়। এই রোগে অনেকে ব্যায়ামের কথা বলেন, তবে কি কি অবস্থায় ব্যায়াম করা যেতে পারে তা জানা দরকার। ব্যায়াম করলে শরীরে যে প্রতিক্রিয়া হয় তাতে রক্ত চলাচল ও হরমোন রস নিঃসরণ প্রভৃতি বাড়ে। শারীরিক পরিশ্রমে ক্যালোরি খরচ বেশি হয় এবং অক্সিজেনের প্রয়োজন বাড়ে। এই অক্সিজেন রক্তের মাধ্যমে এসে মাংসপেশিতে ঢোকে। এ ছাড়া ব্যায়াম করলে শরীরের তাপ বাড়ে এবং তা নিয়ন্ত্রণের জন্য ত্বকের রক্ত চলাচল বাড়ে এবং দেহের তাপ বাইরে চলে যায়। অল্পক্ষণ ব্যায়াম করলে (১ থেকে ২ মিনিট) মাংসপেশির গ্লাইকোজেন থেকে শক্তি পাওয়া যায়। এই গ্লাইকোজেন ভেঙে গ্লুকোজ হয় এবং তার থেকে ল্যাকটিক অ্যাসিড হয়। আবার ব্যায়াম বেশি মাত্রায় করলে গ্লুকোজ উৎপাদন কমে যায় কারণ মাংসপেশি বেশি পরিমাণ গ্লুকোজ ব্যবহার করে। গ্লুকোজ উৎপাদন কমে গেলে ল্যাকটিক অ্যাসিডের পরিমাণও কম হয়।

ব্যায়ামের সময় প্যাংক্রিয়াস কম ইনসুলিন ও বেশি গ্লুকাগন সৃষ্টি করে। ইনসুলিন কমে গেলেও মাংসপেশির মধ্যে রক্ত সঞ্চালন বেড়ে যাওয়ায় এর সরবরাহ কমে না। ব্যায়ামের সময় পিটুইটারী ও এড্রিনাল গ্রন্থির রস বেশি বেরিয়ে আসে। ব্যায়ামের সময় রক্তের মনোসাইট কোষের সঙ্গে বেশি পরিমাণ ইনসুলিন যুক্ত হয়। এতে ইনসুলিন মাংসপেশিতে আসে এবং শক্তি সঞ্চয়ে সাহায্য করে। নিয়মিত ব্যায়াম স্বাভাবিকভাবেই শরীরে কর্মক্ষমতা বাড়ায়। এতে মাংসপেশির অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে। হৃৎপিণ্ডের কাজ ও রক্ত সঞ্চালন ভালভাবে হয়। যে সব ডায়াবেটিক রোগীর ইনসুলিন ইনজেকসন নেবার প্রয়োজন হয় না তাদের ক্ষেত্রে নিয়মিত ব্যায়াম উপকার দেয়। এর ফলে দেহে গ্লুকোজ দহনের ক্ষমতা বাড়ে এবং ইনসুলিনের কার্যকারিতা বাড়ে। রক্তে ট্রাই-গ্লিসারাইড কম হয় এবং রক্তের মুক্ত জৈব অ্যাসিড থেকে শক্তি আহরণের ক্ষমতা বাড়ে, এছাড়া অক্সিজেন গ্রহণ ক্ষমতা বাড়ে। যাদের ইনসুলিন ইনজেকসন নেবার প্রয়োজন হয় তাদের ক্ষেত্রে ব্যায়াম ক্ষতিকর হয়। তারা ব্যায়াম করলে রক্তের গ্লুকোজ বেড়ে যায়। ব্যায়াম করার সময় যে সব অঙ্গ সঞ্চালিত হয়, সেসব স্থানে ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়া ঠিক

নয় । দেখা গেছে, রাত্রে ঘুমানোর সময় অনেকের রক্তের গ্লুকোজ কমে এবং এটি দেখা যায় যদি বিকেল বা তার পরে বেশিক্ষণ ধরে ব্যায়াম করা হয় । শারীরিক ব্যায়াম ডায়াবেটিক রোগীর ক্ষেত্রে সবসময় প্রযোজ্য নয়, তবে অনেক ডাক্তার বলেন যে নিয়মিত ৭-৮ মাইল হাঁটা এই রোগের মাত্রা অনেকটা কমায় । যাঁরা খুব মোটা অর্থাৎ যাঁদের শরীরে মেদ খুব বেশি, তাদের পক্ষে ব্যায়াম অনেকটা কার্যকরী হয় । অনেকদিন যাঁরা এইরোগে ভোগেন তাদের দেহের নানা শিরায় রক্ত চলাচল বাধার সৃষ্টি হয় এবং তাঁরা অত্যাধিক ব্যায়াম করলে রক্তের চাপ বেড়ে যায় এবং তাঁদের চোখের ভিট্রিয়াস ও রেটিনা দিয়ে রক্ত বেরিয়ে আসে । ধীরে ধীরে তাঁদের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট হয়ে যায় । নিয়মিত ব্যায়ামের সাহায্যে শরীরের হৃদযন্ত্রে ও ফুসফুসের কাজ ভালভাবে হয় । তবে রোগীর অবস্থা অনুযায়ী কি ধরনের ব্যায়াম করা উচিত তা উপযুক্ত লোকের কাছ থেকে জেনে নিতে হবে । বিভিন্ন ধরনের আসনের ও যোগমুদ্রার সাহায্যে এই রোগের উপশম ঘটে । কয়েকটি প্রয়োজনীয় আসন যেমন সহজ অগ্নিসার, সহজ প্রাণায়াম, অগ্নিসার ধৌতি, বমন ধৌতি প্রভৃতি এই রোগে উপশম ঘটায় । ওপরের আসনগুলি বা প্রক্রিয়াগুলি সকালের দিকে করতে হয় । এছাড়া সন্ধ্যের দিকে যে যে আসন করা চলে সেগুলির মধ্যে আছে ভ্রমণ প্রাণায়াম, যোগমুদ্রা, পশ্চিমোত্তাসন, সহজ প্রাণায়াম প্রভৃতি । আসনের সঙ্গে আতপস্নানের ব্যবস্থাও করা প্রয়োজন । এই চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেছেন শিবানন্দ সরস্বতী নামে একজন আসন শিক্ষক । তিনি তাঁর যোগবলে রোগারোগ্য বইতে এই আসনগুলির উল্লেখ করেছেন, এবং তিনি খাদ্যের তালিকা থেকে মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি বাদ দিতে বলেছেন । যদিও আধুনিক অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসকরা এই সব খাদ্য গ্রহণের পক্ষে মত দেন ।

দই, নারকেল, পাকাকলা, থোর, মোচা, ডুমুর, শাকসবজী ও টাটকা ফলকে শিবানন্দ সরস্বতী উপাদেয় পথ্য বলে উল্লেখ করেছেন । আর একজন আসনবিদ (শ্রী নীরদ সরকার) জানু-শিরাসনকে এই রোগের চিকিৎসায় উপকারী বলে উল্লেখ করেছেন ।

মোটকথা পথ্যের দিকে ঠিকমত নজর দিলে এবং দুশ্চিন্তা ডাক্তারের কথামত চিকিৎসা চালালে এই রোগে আক্রান্ত হয়েও অনেক বছর বাঁচা যায় । ব্যায়ামের সাহায্যে এই রোগ দূর করতে চাইলে উপযুক্ত ব্যায়ামবিদের কাছ থেক পরমর্শ নিতে হবে ।

আকুপাংচার



আকুপাংচার নামটির সঙ্গে আজকাল আমরা বিশেষভাবে জড়িয়ে পড়েছি। এটি একটি চিকিৎসা পদ্ধতির নাম। মানসিক রোগ, স্ত্রীরোগ, চোখ, কান, গলা, ত্বক প্রভৃতির ব্যথিতে এ চিকিৎসা সুফল দেখাচ্ছে। এছাড়া বাত, পুরুষত্বহীনতা, চর্মরোগ, হাঁপানি, গ্যাসট্রাইটিস, পেপটিক আলসার, দুরারোগ্য ঘা, ব্লাডপ্রেসার, চোখ ওঠা, অর্শ, অ্যানিমিয়া প্রভৃতি রোগে এর প্রচলন আছে। সম্প্রতি চীনে আকুপাংচার অ্যানাস্থেশিয়ার প্রচলন শুরু হয়েছে। সাধারণ অ্যানাস্থেশিয়ার চেয়ে আকুপাংচার অ্যানাস্থেশিয়ার একটি বিশেষ সুবিধে হচ্ছে যে, এক্ষেত্রে রোগীকে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় না এবং অপারেশনের সময় রোগীর দেহযন্ত্র স্বাভাবিক থাকে। যে-সব রোগী কিডনি, ফুসফুস বা রক্তচাপের জন্য ভোগেন তাঁদের ক্ষেত্রে এভাবে অ্যানাস্থেশিয়া প্রয়োগ খুবই কার্যকর। ১৯৭৩ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা গেছে যে, চীনে এই আকুপাংচার অ্যানাস্থেশিয়া প্রয়োগ করে শতকরা ৭০ টির ক্ষেত্রে অপারেশন সফল হয়েছে। এই পদ্ধতিতে পোলিও রোগের চিকিৎসাও চীনে বেশ সফলতা লাভ করেছে।

এ চিকিৎসার আসল ব্যাপারটা হলো সূঁচ ফোটানো। এই পদ্ধতিটি বহু বছর আগেকার। চীন দেশেই তখন এর প্রচলন ছিল। চীনদেশের একটি বই ‘ নাই চিং’। এতে এই পদ্ধতি সম্বন্ধে অনেক কথাই লেখা আছে। এই বইয়ে বিভিন্ন ধরনের সূঁচের কথা বলা হয়েছে এবং সূঁচ ফোটানোর স্থানও নির্দিষ্ট করা আছে।

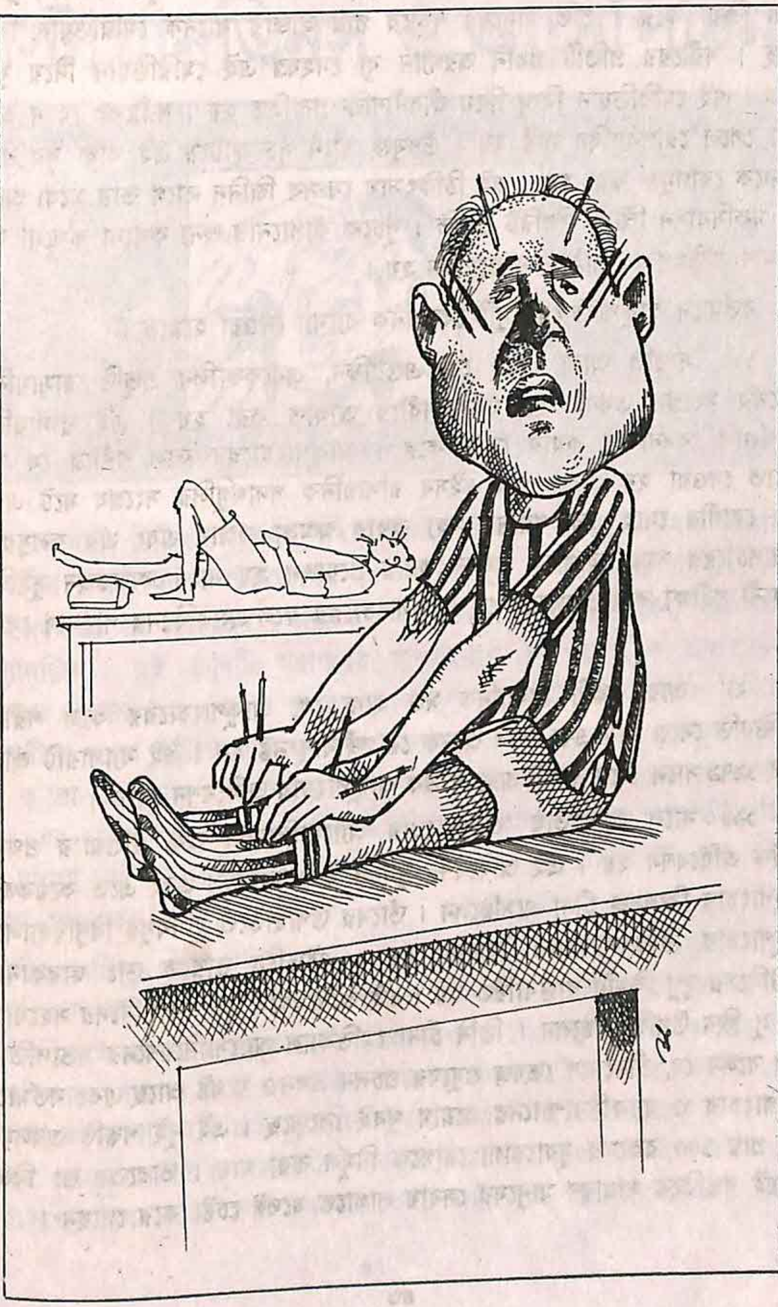
যীশুখ্রীস্টের জন্মের প্রায় ৩৫০ বছর পর একজন চিকিৎসাবিদ হুয়াং কুই 'আকুপাংচার পদ্ধতির ভূমিকা' নামে একটি বই লেখেন। তিনি মানুষের দেহে প্রায় ৩৫০ টি সূঁচ ফোটানোর স্থান নির্দেশ করেন। কিন্তু এই পদ্ধতি বিভিন্ন কারণে মানুষের মনে দাগ কাটতে পারেনি, তাই ধীরে ধীরে এটি প্রায় বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৬৬৪ সাল থেকে ১৮৮২ সাল পর্যন্ত এই চিকিৎসা চীনে আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এরপর ১৯২৮ সালে মাও-সে-তুং তাঁর দেশের গরীব জনসাধারণের চিকিৎসার জন্য এ চিকিৎসা পুনরায় চালু করার উৎসাহ দেন।

সম্প্রতি এই চিকিৎসা পদ্ধতি আবার চীনদেশে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ১৯৫৫ সালে চীনে একটি চিকিৎসা ও গবেষণা কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এই চিকিৎসা পদ্ধতি এখন পৃথিবীর নানাদেশে ছড়িয়ে পড়েছে। ভারত, জাপান, ফ্রান্স, জার্মান, কোরিয়া, কানাডা, আমেরিকা এবং সোভিয়েত রাশিয়াতেও এর চর্চা এখন চলছে। রাশিয়ার বৈজ্ঞানিক ল্যাকাওস্কী ১৯৪২ সাল থেকেই এর গবেষণা করেছেন। পিকিং-এর 'চাইনিজ মেডিসিন অ্যাণ্ড ফার্মাকোলজি'তে-এর সম্বন্ধে বিভিন্ন মূল্যবান প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। নিউইয়র্কে 'অ্যান ইনট্রোডাকশন টু আকুপাংচার টু আকুপাংচার অ্যানাস্থেশিয়া' নামে একটি ডকুমেণ্টারী চলচ্চিত্র তৈরী হয়েছে।

শরীরের বিভিন্ন অংশকে মূলত দু'ভাগে ভাগ করা হয়। ১) স্যাং এবং ২) ফু। 'স্যাং' মানে কঠিন এবং 'ফু' মানে ফাঁকা। স্যাং-এর মধ্যে হৃৎপিণ্ড, প্লীহা, যকৃৎ, ফুসফুস, বৃক্ক এবং হৃৎপিণ্ড আবরণী (পেরিকার্ডিয়াস) ধরা হয় এবং ফু-এর মধ্যে বৃহদন্ত্র, ক্ষুদ্রান্ত্র, পাকস্থলী, মূত্রস্থলী, পিত্তস্থলী এবং স্যানচিয়াও ধরা হয়। স্যানচিয়াও হলো পাকস্থলীর উর্ধ্বাংশ এবং বৃক্কনালী (ইউরেটাস)। অতএব ছয়টি স্যাং এবং ছয়টি ফু নিয়ে মোট বারোটি দেহযন্ত্রকে ধরা হয়। এদের প্রত্যেকের মধ্যে পারস্পরিক যোগসূত্র আছে। এর নাম প্রধান খাত। দেহের প্রয়োজনীয় শক্তি এইসব খাতের ভেতর দিয়ে সবসময় প্রবাহিত হয়। বারোটি দেহযন্ত্রের ছয়টি ইন এবং ছয়টি ইয়াং। প্রত্যেকটি ইন এবং ইয়াং ভিসেরা কর্ম পদ্ধতিতে একে অপরের পরিপূরক। শরীরে দুটি বিপরীতধর্মী শক্তি থাকে। একটি ইয়াং এবং অপরটি ইন। ইয়াং পুরুষধর্মী এবং ইন স্ত্রীধর্মী। এই দুই শক্তিই শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে। ভারসাম্য ঠিক থাকলে একজন মানুষ সুস্থ থাকে নতুবা সে অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই ইন এবং ইয়াং শক্তির চিন্তা এসেছে তাউ দর্শন থেকে এবং এই দর্শনই হলো আকুপাংচারের ভিত্তি স্তম্ভ।

এই পদ্ধতিতে যে সূঁচ ব্যবহার করা হয় তা হাড়, রূপো বা স্টিলের হতে পারে। সাধারণত $\frac{১}{৪}$" থেকে ৪" দৈর্ঘ্যের সূঁচ ব্যবহার করা হয়।

এই চিকিৎসায় ওষুধের ব্যবহার প্রায় নেই। কিন্তু প্রয়োজন ডাক্তারের সিটিং। রোগের প্রকৃতির ওপর এই সিটিং-এর সংখ্যা নির্ভর করে। ডাক্তার ফি কম



করা হলে, এ চিকিৎসায় বহুলোক উপকৃত হতে পারবে । সূঁচ ফোটানো এই চিকিৎসায় উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার চাই, নতুবা রোগমুক্তি না হয়ে রোগ আরও ব্যাপক আকার ধারণ করবে এবং রোগীর মৃত্যুও হতে পারে। সূঁচ ফোটালে স্নায়ুর ওপর ক্রিয়া করে । প্রতি মানুষের শরীরে প্রায় হাজার খানেক মেরিডিয়ান বিন্দু আছে । শরীরের প্রতিটি প্রধান অরগ্যান বা দেহযন্ত্র এই মেরিডিয়ান দিয়ে যুক্ত থাকে । এই মেরিডিয়ান বিন্দু দিয়ে জীবনীশক্তি প্রবাহিত হয় । শরীরের কোন অংশ বাধা পেলে রোগব্যাধির সৃষ্টি হয় । উপযুক্ত স্থানে সূঁচ ফুটিয়ে এই বাধা দূর করে শরীরকে রোগমুক্ত করা হয় । এই চিকিৎসায় যে-সব জিনিস লাগে তার মধ্যে আছে সূঁচ, মকসিবাসন স্টিক, স্পিরিট প্রভৃতি । সূঁচকে কাঁপানোর জন্য কখনো কখনো অল্প পরিমাণ তড়িৎপ্রবাহ পাঠানোর প্রয়োজন হয় ।

বর্তমানে আকুপাংচারের দুটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ।

১) সম্প্রতি জানা গেছে যে, এণ্ডরফিন, এনকেফালিন প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থের সংশ্লেষ তখনই হয় যখন শরীরে আঘাত করা হয় । এই রাসায়নিক পদার্থগুলি বেদনানাশ করার চেষ্টা করে । আকুপাংচারের ফলে শরীরে যে মৃদু আঘাত দেওয়া হয় তাতে করে এইসব রাসায়নিক পদার্থগুলির সংশ্লেষ ঘটে এবং এতে রোগীর দেহে এক ধরনের সহ্য করার ক্ষমতা জন্মায় এবং এর ফলস্বরূপ অস্ত্রোপচারের সময় রোগীকে অজ্ঞান করার প্রয়োজন হয় না । কয়েকজন সুইডিশ বিজ্ঞানী পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, আকুপাংচারের ফলে এণ্ডরফিনের পরিমাণ বেড়ে যায় ।

২) আর একটি বৈজ্ঞানিক মত হচ্ছে যে, আকুপাংচারের ফলে শরীরে অ্যাণ্টিবডি বেড়ে যায় এবং ফলে অনেক রোগজীবাণু নষ্ট হয় । এই ব্যাপারটি জানা গেছে ১৯৭৯ সালে চীনে একটি আন্তর্জাতিক আকুপাংচার অধিবেশন থেকে ।

১৯৮০ সালে কলকাতায় 'আকুপাংচার অ্যাসোসিয়েশন অফ ইণ্ডিয়া'র প্রথম বার্ষিক অধিবেশন হয় । এই অধিবেশন দু'দিন ধরে হয়েছিল এবং এতে কয়েকজন আকুপাংচার বিশেষজ্ঞ চীনা এসেছিলেন । তাঁদের উপস্থিতিতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে আকুপাংচার চিকিৎসাশাস্ত্রের উদ্বোধন হয় । এইভাবে ভারতে ডাঃ দ্বারকানাথ কোটনিসের স্বপ্ন কিছুটা বাস্তবায়িত হয় । এই অধিবেশনে ডাঃ কোটনিসের সহযোগী ডাঃ লু জিন উপস্থিত ছিলেন । তিনি চীনা মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি । তিনি বলেন যে, চীনদেশে ভেষজ ওষুধের প্রচলন এখনও যথেষ্ট আছে এবং বর্তমানে আকুপাংচার ও ম্যাকসিবাশ্চানের প্রয়োগ খুবই বেড়েছে । এই দুই পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রায় ১০০ রকমের দূরারোগ্য রোগকে নির্মূল করা যায় । ভারতের ডঃ বিজয় বসু এই পদ্ধতিকে সাধারণ মানুষের সেবায় লাগাতে যথেষ্ট চেষ্টা করে গেছেন ।

প্রস্টাগ্লানডিনস্ ও অ্যাসপিরিন



১৯৮২ সালে চিকিৎসা বিজ্ঞান শাখায় তিনজন বিজ্ঞানী একত্রে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। এরাঁ হলেন স্টকহোমের ডঃ সুন বার্গস্ট্রম ও ডঃ বেঙ্গট স্যামুয়েলসন এবং ইংল্যাণ্ডের ডঃ জন ভেন। এরাঁ এক নতুন ওষুধ আবিষ্কার করেন, যার নাম প্রস্টাগ্ল্যানডিন। এই ওষুধটি মূত্রাশয়ের পাথুরীরোগ এবং পেপটিক আলসারের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। কোন জন্তুর (যেমন কুকুর) প্রস্টেট গ্রন্থির নির্যাস বিভিন্ন জন্তুর শরীরে প্রবেশ করিয়ে তার ফলাফল পর্যালোচনা করা হয়। এতে দেখা যায়, কারো কারো রক্ত চাপ বাড়ে বা কারো কারো কমে। কারো হাঁপানি সারে বা বাড়ে। এর মূলে দেখা গেল এক ধরনের রাসায়নিক পদার্থ আছে। প্রস্টেট গ্রন্থি থেকে পাওয়া এই রাসায়নিক পদার্থগুলির নাম একত্রে প্রস্টাগ্লানডিনস এবং এই নামকরণ করেন ভন ইউলার।

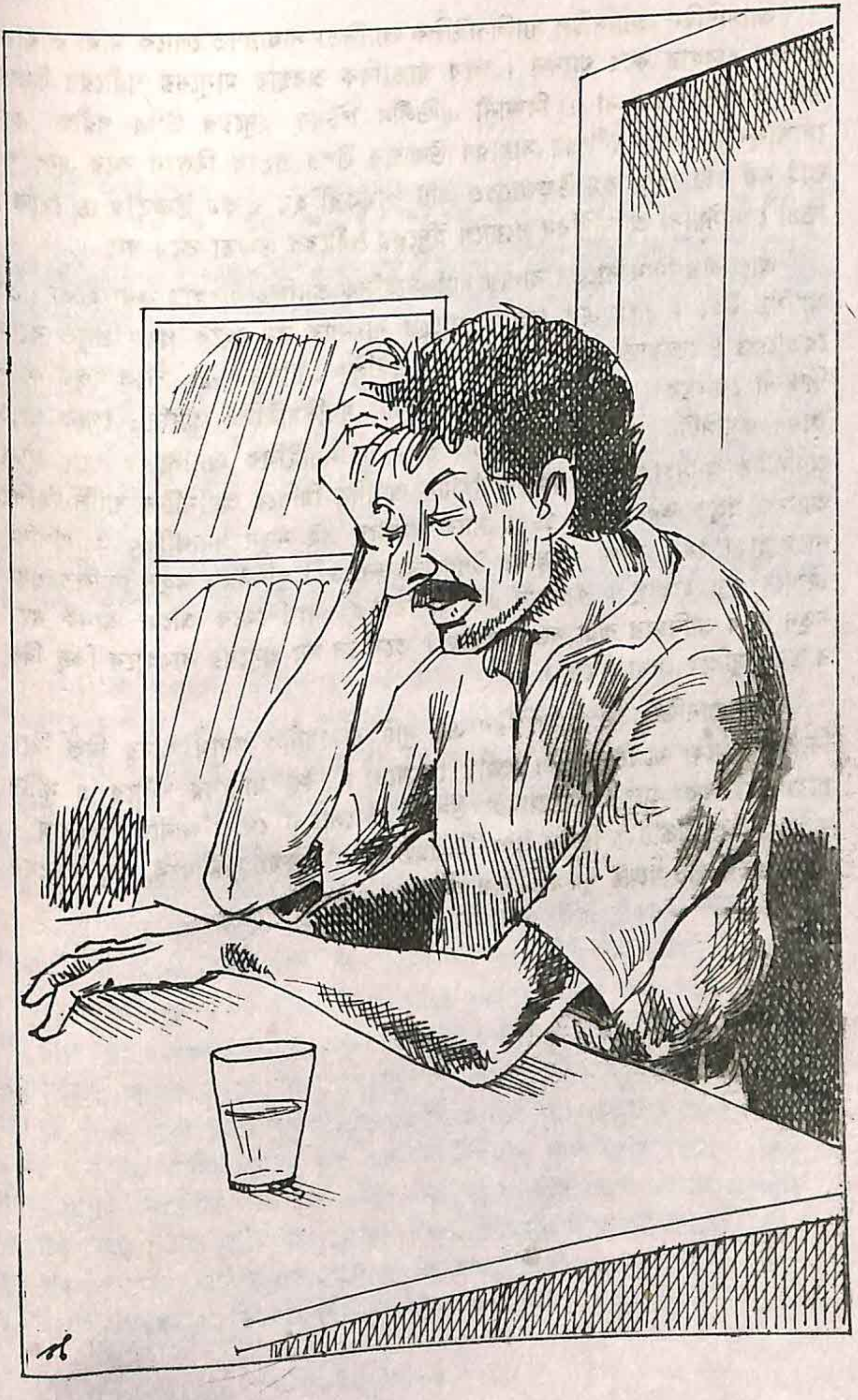
প্রস্টাগ্ল্যানডিনও আবার বিভিন্ন উৎস থেকে সংগ্রহ করার পর বিভিন্ন নামে নামকরণ করা হয়। যেমন প্রস্টাগ্ল্যানডিন এ. বি. ই এবং এফ। এগুলির মধ্যে প্রস্টাগ্ল্যানডিন ই এবং এফ মানুষ বেশী কাজে লাগাতে পেরেছে। প্রস্টাগ্ল্যানডিন ই রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। পৌষ্টিক ক্ষরণের জন্য পৌষ্টিক ক্ষতের সৃষ্টি হয় এবং ক্ষরণ কমান যায় যদি প্রস্টাগ্ল্যানডিন ই (২) প্রতিযৌগ (Analogue) ব্যবহার করা যায়। বহুমূত্ররোগও প্রস্টাগ্ল্যানডিন ব্যবহার করা হয়। একজন মহিলা যখন মা হতে চলেছেন তখন তার প্রসব বেদনার জন্য দায়ী হচ্ছে প্রস্টাগ্ল্যানডিন। এই

প্রস্টাগ্ল্যানডিনের কাজকে বিলম্বিত করতে পারে একটি ওষুধ যার নাম অ্যাসপিরিন। সুতরাং প্রসবকালীন সময়ে অ্যাসপিরিন গ্রহণ করা উচিত নয় । ইংল্যাণ্ডের ডঃ জনভেন তাঁর সহযোগীদের নিয়ে অ্যাসপিরিনের উপর কাজ করেন এবং দেখেন যে এটি প্রস্টাগ্ল্যানডিনের কাজে বাধা সৃষ্টি করে । ডঃ করিম নামে বাংলাদেশের এক ডাক্তার (বর্তমানে উগাণ্ডার অধিবাসী) প্রস্টাগ্ল্যানডিন এফ-আলফা (PGF) শিরার মধ্যে ইনজেকশন করে একজন গর্ভবতী মহিলার প্রসবের কাজে ব্যবহার করেন। বর্তমানে গর্ভপাত করানোর কাজে এবং অনিয়মিত ঋতুচক্রের চিকিৎসায় প্রস্টাগ্ল্যানডিনের প্রয়োগ সম্পূর্ণভাবে সাফল্য লাভ করেছে । কৃত্রিম উপায়ে উৎপন্ন প্রস্টাগ্ল্যানডিনকে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে প্রাকৃতিক প্রস্টাগ্ল্যানডিনের চেয়ে এর কার্যক্ষমতা প্রায় অর্ধেক । কতকগুলি স্নেহজাতীয় অ্যাসিডকে কয়েকটি ধাপে বিভিন্ন উৎসেচকের উপস্থিতিতে বিক্রিয়া ঘটিয়ে ভ্যানওরপ এবং বার্গস্ট্রম প্রস্টাগ্ল্যানডিন ই (১), ই (২), ই (৩) এবং এফ (২) তৈরী করতে সক্ষম হন ।

এক ধরনের সামুদ্রিক প্রাণীর শরীর থেকেও প্রস্টাগ্ল্যানডিন পাওয়া যায় । বিভিন্ন অসুখে প্রস্টাগ্ল্যানডিনের মাত্রা বেড়ে যায় এবং এই প্রস্টাগ্ল্যানডিন তৈরী হবার ব্যাপারটাকে কমিয়ে রাখতে পারে অ্যাসপিরিন গ্রুপের ওষুধ । বর্তমানে জন্মনিয়ন্ত্রণ বড়ি তৈরীতে প্রস্টাগ্ল্যানডিন ব্যবহার করা হয় । প্রস্টাগ্ল্যানডিন পেশী উদ্দীপকের কাজ করে একং তা নির্ভর করে শরীরের ক্যালসিয়াম ও ক্যালসিয়াম নির্ভর এক ধরনের উৎসেচকের উপর ।

ওষুধ হিসেবে আমরা অ্যাসপিরিন ব্যবহার করি । এটি একটি মৃদু ব্যথা কমানোর এবং জ্বরনাশক কঠিন পদার্থ । কেউ কেউ এটিকে প্রদাহ, বাত ও গেঁটে বাতের ব্যথায় ব্যবহার করেন । তবে এর ব্যবহার খুব একটি নিরাপদ নয়, কারণ শরীরে এর আরো প্রতিক্রিয়া দেখা যায় । এর ফলে গ্যাস্ট্রিক ও রক্তপাত বেড়ে যায় । তাই পাকস্থলীর অসুখে এটি ব্যবহার করা হয় না । অল্পবয়সে বেশি অ্যাসপিরিন ব্যবহার করলে শরীরে রক্তশূন্যতা দেখা দেয় । এর কারণ হচ্ছে এটি শরীরের অভ্যন্তরে রক্তপাত ঘটাতে সাহায্য করে ।

আমাদের শরীর অসংখ্য কোষ দিয়ে তৈরী । এর মধ্যে ছোট ছোট রক্তকোষ আছে যার নাম প্লেটলেটস । এগুলি রক্তকে জমাট বাঁধতে সাহায্য করে। অ্যাসপিরিন আবার রক্ত জমাট বাঁধায় বাধা দেয়। তাই রক্ত জমাট বাঁধা সংক্রান্তরোগে এটি ব্যবহার করা হয় । করোনারী আর্টারী থ্রমবোসিসের ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে এটি বেশ কার্যকর হয় । হৃদরোগে এটির ব্যবহারের কথা শোনা গেলেও এর পেছনে কোন বলিষ্ঠ যুক্তি পাওয়া যায়নি । অনেকে অবশ্য প্রতিষেধক হিসেবে এর বড়ি নিয়মিত খান, তবে এটি ব্যবহার না করলে যে কোন ক্ষতি হতে পারে, তাও সঠিক বলা যায় না ।

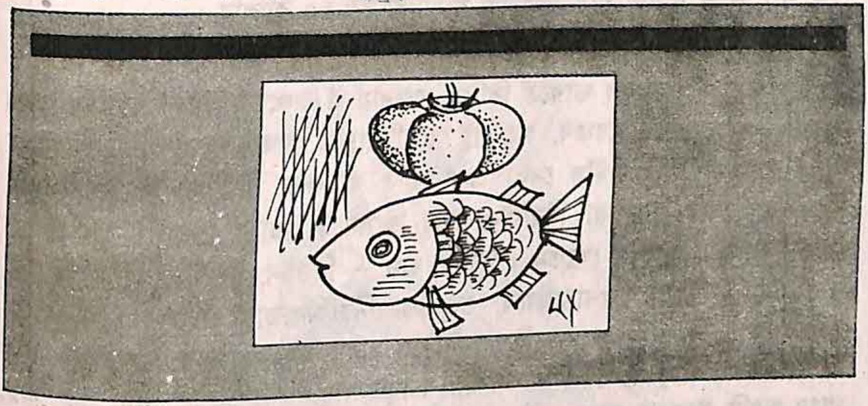


অ্যাসপিরিন (অ্যাসিটিল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড) সাধারণত লোকে মাথা ও জ্বরের উপশমে ব্যবহার করে থাকেন। তবে স্বাভাবিক অবস্থায় মানুষের শরীরের উষ্ণতা এটি কমাতে পারে না। বিজ্ঞানী এভিলীন স্টিনফ্ ইঁদুরের উপর পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, এটি শরীরের সাধারণ উষ্ণতার উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং শুধু তাই নয় তার চেয়ে কম উষ্ণতাতেও এটি কার্যকরী হয়। কম উষ্ণতায় (৪ থেকে ৫ ডিগ্রী সেলসিয়াস) অ্যাসপিরিন প্রয়োগে ইঁদুরের শরীরের উষ্ণতা কমে যায়।

আগেকার দিনে বাতের ব্যথায় স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ব্যবহার করা হতো। এই অ্যাসিড উইলো নামে এক ধরনের গাছের বাকলার রস থেকে প্রথম প্রস্তুত করেন রেভারেণ্ড ও ডেয়োর্ডস্টোন। কৃত্রিম স্যালিসাইলিক অ্যাসিড ১৮৫৯ সালে প্রস্তুত করেন বিজ্ঞানী কোলবে। ১৮৯৭ সালে ডঃ হফম্যান স্যালিসাইলিক অ্যাসিড থেকে প্রস্তুত করেন অ্যাসিটিল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের সঙ্গে ফুটন্ত অ্যাসিটিক অ্যানহাইড্রাইড এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড মিশিয়ে অ্যাসিটিল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড প্রস্তুত করা হয়। ১৮৯৯ সালে বাজারে এই নতুন পদার্থটিকে অ্যাসপিরিন নামে ছাড়া হয়। ব্যাথা ও জ্বরের উপশমের জন্য এটি পৃথিবীতে বহুল প্রচলিত ওষুধ হিসাবে গণ্য হয়েছে। বর্তমানে এই রাসায়নিক পদার্থ থেকে আরো অনেক নতুন নতুন ওষুধ আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। তবে সে সব ওষুধের ব্যবহারে কিছু কিছু বাস্তব অসুবিধে দেখা দিচ্ছে।

প্রস্টাগ্ল্যানডিন ও অ্যাসপিরিন এই দুটি রাসায়নিক পদার্থ ধর্মের দিক দিয়ে নিজেদের মধ্যে যথেষ্ট পার্থক্য বজায় রেখেছে। কিন্তু মানুষের শরীরে এ দুটির প্রয়োগ যে কত ব্যাপক তা আমরা উপরের আলোচনা থেকে জানতে পারলাম। যদিও শরীরে একটি অপরটির সঙ্গে বিভিন্নভাবে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, তবু মানুষের কাছে পদার্থ দুটি যথেষ্ট গুরুত্ব আদায় করছে।

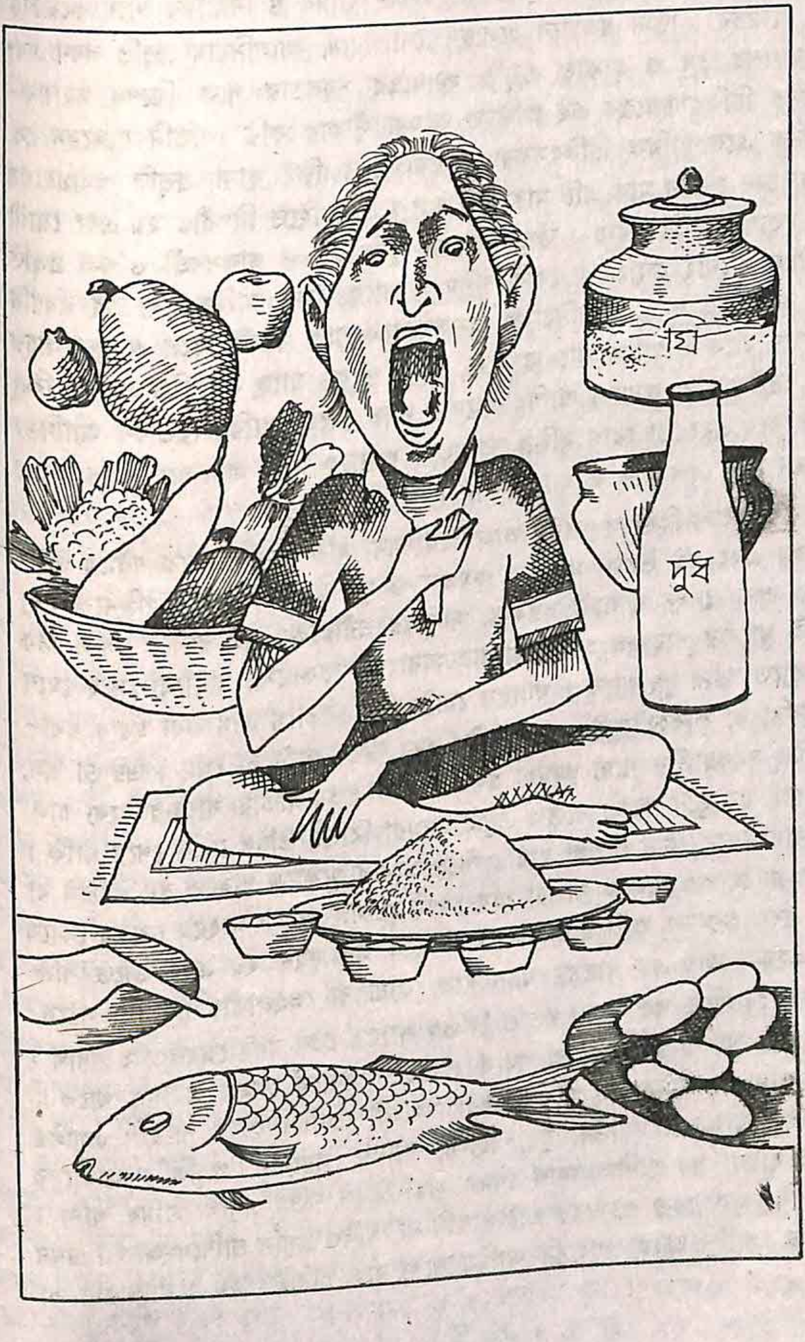
কী খাব ঃ আমিষ না নিরামিষ ?



বিশ্বকবি বলেছেন 'মরিতে চাহিনা আমি সুন্দর ভুবনে মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই ।' কিন্তু বাঁচতে চাইলেই তো আর বাঁচা যায় না । কারণ, আমরা জানি, 'জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে ?' তাই এই নশ্বর দেহকে একদিন ছেড়ে যেতে হবে সবাইকে । বাঁচার আর একটা অর্থ অবশ্য আছে এবং তা হলো মানুষের মনে বহু বছর বেঁচে থাকা । মৃত্যুর পরও একজন মানুষ তাঁর খ্যাতি নিয়ে বহুকাল বেঁচে থাকতে পারেন । কিন্তু শরীরকে চিরস্থায়ী করা কখনই সম্ভব নয় । শুধু তাই নয়, খাদ্য ছাড়া মানুষ কয়েকদিনের বেশি বাঁচতে পারে না । খাদ্যের জন্য তাকে বিভিন্ন প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর নির্ভর করতে হয় । খাদ্যের অভাব হলে শরীরের সঞ্চিত খাদ্য প্রথমত খাদ্য সরবরাহ করে, কিন্তু তা শেষ হলে প্রাণী মারা যায় । এখন এই নশ্বর দেহকে বেশিদিন বাঁচিয়ে রাখতে আমরা কি খাদ্য বেছে নেব – আমিষ, না নিরামিষ, সেটাই হল প্রশ্ন । অনেক আমিষভোজীর ধারণা স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য মাছ, মাংস ডিম প্রভৃতি আমিষ খাদ্য-শরীরের পক্ষে একান্ত দরকার । যদিও আমিষ শব্দের অর্থ (অম + ইষ) যে খাদ্য রোগ আনে । কিন্তু বর্তমান যুগের একশ্রেনীর ডাক্তাররা বলেন মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি না খেলে শরীর ঠিকভাবে বেড়ে উঠতে পারে না । তাঁরা বলেন, খাওয়ার উপযোগী পশুর কিডনি, যকৃত খুব উপকারী । অনেক মাছ থেকে পাওয়া যায় ভিটামিন এ এবং ডি । এছাড়া প্রোটিন তো আছেই । ডিমের হলুদ ও সাদা অংশ দুইই উপকারী । বর্তমানে

গবেষণায় ধরা পড়েছে যে, ডিমের সাদা অংশ খেলে ক্যানসার প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ে। ডিমের কুসুমে যে বায়োটিন আছে তা শরীরের পক্ষে খুব প্রয়োজনীয়। এইসব প্রোটিন থেকে শরীর প্রয়োজনীয় ক্যালরি পায়। প্রসঙ্গত বলা যায় প্রতি ১০০ গ্রাম মাংস থেকে প্রোটিন পাওয়া যায় শতকরা ২৫ ভাগ, ফ্যাট ৩-৫ ভাগ এবং এদের থেকে পাওয়া যায় ১৩০ ক্যালরি। সমপরিমাণ রুই মাছ থেকে ১৬.৫ ভাগ প্রোটিন, ১.৫ ভাগ ফ্যাট পাওয়া যায় এবং এর খাদ্যমূল্য হল ৮০ ক্যালরি।

আমিষভোজীর সংখ্যা পৃথিবীতে খুব বেশি হলেও, নিরামিষভোজীর সংখ্যাও খুব কম নয়। আমাদের ভারতে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও অঞ্চলের লোক নিরামিষ ভক্ষণ করেন। মাড়োয়ারী, বৈষ্ণব, মহারাষ্ট্র ও বিহারের ব্রাহ্মণ, গুজরাতীরা নিরামিষ খান। পৃথিবীর বহু ধর্মীয় নেতা ও বিখ্যাত ব্যাক্তিরা নিরামিষ খেতেন। বুদ্ধ, শ্রীচৈতন্য, কবীর প্রভৃতিরা নিরামিষভোজী ছিলেন। এছাড়া ভারতীয় মুনি-ঋষিরা বেশির ভাগই নিরামিষ খেতেন। শোনা যায় – নিউটন, টলস্টয়, প্লুটো, মিলটন, ডারউইন, গান্ধিজী, বিনোবাভাবে, প্রভৃতিরা নিরামিষভোজী ছিলেন। যীশুখ্রীস্ট, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ প্রভৃতি মনীষিরা নিরামিষ খাদ্যের সপক্ষেই যুক্তি দেখিয়েছেন। যীশু বলেছেন, শাকসব্জী, ফলমূল মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য এবং মাছ, মাংস প্রভৃতি উত্তেজক খাদ্য। বিখ্যাত পণ্ডিত জি এল রুড তাঁর 'দ্য কেস ফর ভেজিটারিয়ানিজম' গ্রন্থে বলেছেন, আমিষভোজীদের মধ্যে টি.বি, ক্যান্স্যার ও হার্টের রোগের সম্ভাবনা বেশি। গীতায় বলা হয়েছে যে খাদ্যাভাস চিন্তা ও মনোবৃত্তিকে প্রভাবাবিনৃত করে। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ খাদ্যকে সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিনভাগে ভাগ করেছেন। নিরামিষ খাদ্যকে সাত্ত্বিক খাবার বলা হয়েছে। সাত্ত্বিক খাবার খেলে মানুষ উদ্যমী, অহংকারশূন্য, বুদ্ধিমান হয়। রাজসিক খাবার মানুষকে ঈর্ষাপরায়ন, হিংস্র, কর্মফলমুখী করে। অতিরিক্ত আম্লিক খাবার মোছ, মাংস ইত্যাদি), গরম ও ঝালযুক্ত খাবার রাজসিক খাবারের মধ্যে পড়ে। তামসিক খাদ্য মানুষকে শঠ, উদ্ধত, অলস ও বিদ্রেষী করে তোলে। ঠাণ্ডা, বাসি, পচা প্রভৃতি খাবার এই ধরনের খাদ্য। সুশ্রুত সংহিতায় বলা হয়েছে – বিশুদ্ধ আহার খেলে চিত্ত শুদ্ধি হয়। বিশুদ্ধ চিন্তা থেকে ভাগবত জ্ঞান হয় এবং অভক্ষ্য ভক্ষণে চিত্ত অশুদ্ধ হয়, ভ্রান্তজ্ঞানের সৃষ্টি হয় এবং তাতে মানুষ পাপকাজ করায় লিপ্ত হয়। এছাড়া নিয়মিত মাংস ও মদগ্রহণ করলে মানুষ কামপ্রবণ হয়। খাদ্য পাকস্থলীতে জীর্ণ হয়ে শক্তি জোগায়। শরীরের স্নায়ুতন্ত্রীতে বিভিন্ন খাদ্যের গুণও ছড়িয়ে পড়ে এবং মানুষের চিন্তা ও কর্মকে উদ্দীপিত করে। অনেক পণ্ডিতব্যক্তি বলেন, ফলমূল পচলে বা বাসি হলে সেই খাদ্য যত বিষক্রিয়া ঘটায় তার থেকে অনেক বেশি বিষক্রিয়া দেখা দেয় পচা মাছ মাংস খেলে। মাছের থেকে মাংসের বিষক্রিয়া আরও বেশি দেখা গেছে। তাই বন্য শিকারীরা অনেক সময় তীরের ফলায় পচা মাংসের রস


ঘি
দুধ

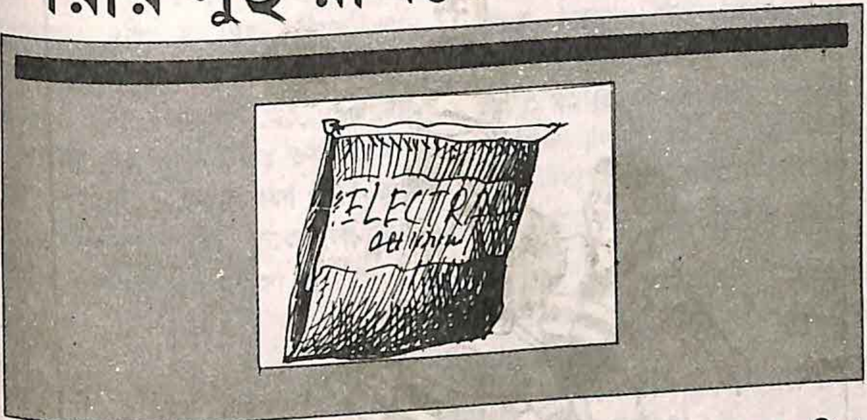
লাগিয়ে নেয় এবং তা শুকিয়ে নিয়ে শিকারে যায়। বিশিষ্ট আসনবিদ স্বামী শিবানন্দ সরস্বতী তাঁর 'যোগবলে রোগ-আরোগ্য' বইতে আমিষ ও নিরামিষ নিয়ে কয়েকটি কথা বলেছেন। তিনি একস্থানে বলেছেন, সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম প্রভৃতি লবণ এবং বিবিধফলের রস ও গ্লুকোজ প্রভৃতি হৃদযন্ত্রের সবলতার পক্ষে বিশেষ সহায়ক– আধুনিক চিকিৎসাশাস্ত্রের এই অভিমত আমরা স্বীকার করি। তিনি বলেছেন যে, আধুনিক এলোপ্যাথিক চিকিৎসকরা হৃদরোগীদের ডিম ছানা প্রভৃতি পথ্যগ্রহণের ব্যবস্থা দেন। তাঁর মতে এটি মারাত্মক ভুল। এতে হিতে বিপরীত হয় এবং রোগী দ্রুত মৃত্যুপথে এগিয়ে যায়। তাঁর বক্তব্যের যুক্তি হল – শাকসবজী ও ফল প্রভৃতি নিরামিষ খাদ্যেই সোডিয়াম বেশি পরিমাণে থাকে, কিন্তু আমিষখাদ্যে এই লবণটি নেই বললেই চলে। ক্যালসিয়ামও অনুরূপভাবে শাক সবজী, ফলে ও দুধে প্রচুর পরিমাণে থাকে। আমিষ খাদ্যের মধ্যে, মাংস ও বড় মাছে ক্যালসিয়াম নেই, কিন্তু ডিম, ছোটমাছ ও অন্যান্য আমিষ খাদ্যের ন্যায় দেহে অম্লবিষ (ইউরিক অ্যাসিড) সঞ্চিত করে এবং তা রোগ বৃদ্ধির সহায়ক। ছানাকে তিনি হৃদরোগে বর্জন করতে বলেছেন কিন্তু কেন তার ব্যাখ্যা দেন নি।

এখন খাদ্য কিভাবে শরীরে কাজ করে জানা যাক। খাদ্য থেকে শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি হয় এবং এই উত্তাপ মানুষকে কর্মক্ষম ও সুস্থ রাখে। একটা ইঞ্জিনকে চালু রাখতে গেলে যেমন জ্বালানী দরকার, মানুষের শরীরকেও সুস্থ রাখতে গেলে ঠিক তেমনই খাদ্যের প্রয়োজন হয়। খাদ্যের সারাংশ পাচকরসের সাহায্যে দেহে মেশে এবং তাতে শরীর সুস্থ থাকে। খাদ্যকে মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা হয়। যথা– (১) শর্করা বা কার্বহাইড্রেট (২) প্রোটিন এবং (৩) ফ্যাট বা স্নেহ। এছাড়া জল, ভিটামিন লবণজাতীয় খাদ্য আমরা গ্রহণ করি। শর্করাজাতীয় খাদ্যের মধ্যে চাল, ডাল, গম, যব ভুট্টা প্রভৃতি পড়ে। এগুলি আমরা বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে পেয়ে থাকি। এসব খাদ্য থেকে স্টার্চ পাওয়া যায়। স্টার্চ আবার গ্লুকোজে পরিণত হয়। চিনি বা ইক্ষু শর্করা থেকেও গ্লুকোজ পাওয়া যায়। এই গ্লুকোজ রক্তের মাধ্যমে দেহের কোষে আসে এবং সেখানে অক্সিজেনের সংস্পর্শে তার মৃদু দহন হয় এবং তাতে শক্তি উৎপন্ন হয়। আর এক ধরনের খাদ্য হলো ফ্যাট বা স্নেহজাতীয় পদার্থ। সরষে, নারকেল, রেপসীড, কডলিভার প্রভৃতি বিভিন্ন জাতের তেল সবই স্নেহজাতীয় পদার্থ। এছাড়া ঘি, মাখন, প্রভৃতিও স্নেহপদার্থ। এইসব পদার্থে স্নেহজ অ্যাসিড থাকে। অনেক খাদ্য আছে যেগুলি থেকে আমরা সহজেই প্রোটিন পেতে পারি। এগুলির মধ্যে পড়ে মাছ, মাংস ডিম, দুধ, ছোলা, বাদাম, সয়াবীন, প্রভৃতি। আমাদের সাধারণ ধারণা সব প্রাণিজ পদার্থ যেমন মাছ, মাংস, ডিম এগুলি আমিষ খাদ্য। আমরা কিন্তু দুগ্ধ, ছানা প্রভৃতিকে আমিষ বলি না, যদিও এগুলি প্রাণিদেহজাত। এখন যে খাদ্যে প্রোটিন আছে, তাই কি আমিষ খাদ্য বলে পরিচিত হয়? ব্যাপারটা তা

নয় । প্রাণিজ প্রোটিনকে আমিষ ধরা হচ্ছে এবং উদ্ভিজ প্রোটিনকে নিরামিষ ধরা হচ্ছে । দেখা গেছে সয়াবীনে প্রোটিনের পরিমাণ হচ্ছে মাংসের চেয়েও বেশি এবং তা নিরামিষ হিসাবে গণ্য হয় । প্রোটিন হচ্ছে কতগুলি অ্যামিনো অ্যাসিডের দ্বারা গঠিত এক ধরণের যৌগ । শরীরকে বাঁচাতে প্রোটিনের ভূমিকা খুব বেশি, কারণ শরীরের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ প্রোটিনের সাহায্যে তৈরি হয় । প্রোটিনের পরিপাক কাজ শেষ হলে তা নানারকম অ্যামিনো অ্যাসিডের সৃষ্টি করে । প্রাণিজ প্রোটিন উদ্ভিজ প্রোটিনের চেয়ে সহজে হজম করা যায় । শরীরে প্রোটিনের ভাঙ্গনকে সহজ করতে কতগুলি উৎসেচক কাজে লাগে । অর্থাৎ প্রোটিন খাদ্য হজমে উৎসেচকের যথেষ্ট ভূমিকা আছে । দেহের পরিপাক ক্রিয়ায় প্রোটিন অণু ভেঙ্গে একক অ্যামিনো অ্যাসিডে পরিণত হয় এবং তা রক্তে শোষিত হয়ে লিভার ও অন্যান্য অংশে আসে । প্রাণিজ ও উদ্ভিজ প্রোটিনে আছে নানা ধরণের অ্যামিনো অ্যাসিড । প্রোটিন অণু থেকে যে সব অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায়, সেগুলির বেশির ভাগই দেহ বিভিন্ন খাদ্য থেকে নিজেই তৈরি করতে পারে । তবে প্রয়োজনীয় আটটি অ্যামিনো অ্যাসিড দেহ সৃষ্টি করতে পারে না । এই আটটি অ্যামিনো অ্যাসিডকে অত্যবশ্যকীয় অ্যামিনো অ্যাসিড বলে । প্রায় সবরকম প্রাণিজ প্রোটিন থেকে এই অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় । এবং সেই কারণে প্রাণিজ প্রোটিনের উপযোগিতা খুব বেশি । বিভিন্ন রকম উদ্ভিজ প্রোটিন থেকেও এই অত্যবশ্যকীয় প্রোটিন পাওয়া যায় । সাধারণভাবে বলা যায় যে, প্রত্যেক মানুষের রোজ একট নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রোটিনের প্রয়োজন হয় । এই প্রোটিনের প্রয়োজন দৈহিক ওজনের সঙ্গে একটা সামঞ্জস্য বজায় রাখতে । দৈহিক ওজনের প্রতি কিলোগ্রামের জন্য পূর্ণবয়স্ক একজন ব্যক্তির একগ্রাম করে প্রোটিন খাওয়া দরকার । অর্থাৎ ৬০ কেজি ওজনের একজন মানুষের দৈনিক কম করে ৬০ গ্রাম মত প্রোটিনের প্রয়োজন হতে পারে । যাঁরা আমিষ খান তারা অর্ধেকের বেশি প্রোটিন পান মাছ, মাংস, ডিম প্রভৃতি থেকে এবং বাকীটা ডাল, শাক-সবজী প্রভৃতি থেকে । তবে নিরামিষভোজীরা পুরো প্রোটিন পেয়ে থাকেন উদ্ভিজ প্রোটিন থেকে । প্রয়োজনের বেশি প্রোটিন দেহের বিপাকক্রিয়ায় প্রথমে শর্করা এবং পরে তা ফ্যাটে পরিণত হয় । ভাজা মাছ বা বেশি মশলাযুক্ত মাছ বা মাংস খেলে পরিপাকক্রিয়ার কাজ ভালভাবে হতে পারে না । অর্থাৎ অনেকে ঐ ধরণের আমিষ খাদ্য সহ্য করতে পারেন না । এছাড়া অনেকের মানসিক গঠন এমন যে তাঁরা যে মাংস খান সেই মাংস ছাড়া অন্য পশুর মাংস খেলেই অসুস্থবোধ করেন, তাঁদের নতুন কোন মাংস না খাওয়াই ভালো । একসময় মুরগীর মাংসের খুব একটা চল ছিল না, এখন কিন্তু এই মাংসের চাহিদা খুব বেশি । বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ধরণের প্রাণিজ প্রোটিন খাওয়ার অভ্যেস আছে । যেসব মানুষের শুয়োর, গরু, প্রভৃতির মাংস খাওয়ার অভ্যেস নেই, তাঁরা ঐসব পশুর মাংস খেলে অনেকসময় অসুস্থ হয়ে পড়েন । অনেকের ধারণা আমিষভোজীরা দীর্ঘজীবি হতে পারেন না, কিন্তু বাস্তবে তা ঠিক নয় । শরীর যে

সব আমিষ খাদ্য সহ্য করতে পারে, সেই রকম খাদ্যে কোন অসুখ হবার কথা নয়। নিরামিষভোজীদের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। শরীর সুস্থ রাখতে হলে, পরিমাণ মত সুপাচ্য খাদ্য খেতে হবে যাতে শরীর তার প্রয়োজনমত ক্যালরি পায়। সহজপাচ্য খাদ্য আমিষ বা নিরামিষ দু'রকমই হতে পারে। খাদ্য থেকে দেহ যে ক্যালরি পায় তার বেশির ভাগই খরচ হয় পেশী সঞ্চালনে। হাঁটা- চলা, ব্যায়াম ও বিভিন্ন কাজ করার সময় পেশী সঞ্চালনের প্রয়োজন হয়। যে মানুষ যত বেশি পরিশ্রম করেন তাঁর তত বেশি ক্যালরির প্রয়োজন হয়। তাই বুদ্ধিজীবিদের চেয়ে শ্রমজীবিদের বেশি ক্যালরিযুক্ত খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। সাধারণভাবে একজন নারীর চেয়ে একজন পুরুষের বেশি ক্যালরি প্রয়োজন হয়। একজন কমপরিশ্রমী পুরুষের দৈনিক ২৪০০ থেকে ২৬০০ ক্যালরির প্রয়োজন এবং অনুরূপ একজন নারীর ক্ষেত্রে ২০০০ থেকে ২৩০০ ক্যালরির প্রয়োজন। কঠিন পরিশ্রমকারী পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে তাদের প্রয়োজনীয় ক্যালরির মান আরও ৫০০–৭০০ ক্যালরির মত বেশি লাগে। অসুস্থ অর্থাৎ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে খাদ্যতালিকা নির্বাচনের প্রশ্ন সবসময়ই আসে। তবে শরীরের প্রয়োজনীয় ক্যালরির যাতে অভাব না হয়, সেদিকে নজর দিতে হবে। আমিষ কি নিরামিষভোজী সেটা বড় কথা নয়, প্রধান কথা শরীরের প্রয়োজনমত খাদ্য শরীরকে দিতে হবে এবং তাতেই দীর্ঘজীবি হওয়া সম্ভবপর হবে।

শরীর সুস্থ রাখতে লবণ ও চিনি



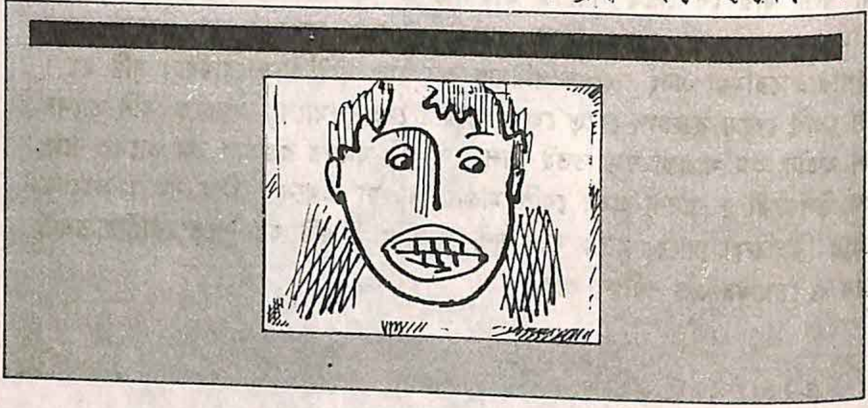
চিনি এবং লবণ এ দুটি খাদ্যবস্তুর সঙ্গে আমাদের পরিচয় খুব বেশি । ডায়াবেটিস রোগীর কাছে চিনি এবং উচ্চরক্তচাপযুক্ত রোগীর কাছে লবণের কদর না থাকলেও অন্য সকলের কাছে এ দুটির প্রয়োজন খুব বেশি ।

সাধারণভাবে বলা যায় এই পদার্থ দুটির অভাব হলে মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে । অনেকসময় বিভিন্ন কারণে কোন লোকের বারবার বমি বা পায়খানা হয় । তাতে শরীর থেকে অনেকটা জল বেরিয়ে যায় । শুধু তাই নয়, জলের সঙ্গে আরো নানা ধরণের লবণ বেরিয়ে আসে । এতে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে । এই অবস্থাকে ডি-হাইড্রেশন বা জলশূন্যতা বলে । শিশুদের ক্ষেত্রে এরকমটি হলে মৃত্যুও অস্বাভাবিক নয় । এর থেকে বাঁচতে হলে বিশুদ্ধ জলে সামান্য নুন আর চিনি মিশিয়ে রোগীকে খাওয়াতে হবে । এর ফলে শরীরের পক্ষে প্রয়োজনীয় লবণ ও ফ্লুইড ফিরে আসে এবং তাতে রোগী ধীরে ধীরে সুস্থবোধ করে । কিন্তু পেটের অসুখ যদি ব্যাকটিরিয়া বা ভাইরাসের জন্য হয় সেক্ষেত্রে শিরার মধ্যে ইনজেকশন দেওয়ার প্রয়োজন হয় । যাকে ইনট্রাভেনাস থেরাপি বলে । উন্নত দেশগুলিতে ওরাল রিহাইড্রেশনের ব্যবস্থা করা হয় । এর আসল কথা – সেই লবণ ও চিনির প্রয়োগ, অবশ্য এক নির্দিষ্ট মানে । ওরাল রিহাইড্রেশনের একটি ফর্মূলা ঠিক করে দিয়েছে বিশ্ব-স্বাস্থ্য সংস্থা, যাতে ৩ থেকে ৪ গ্রাম মত সাধারণ লবণ (বা সোডিয়াম ক্লোরাইড), ঐ পরিমাণ পটাসিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাই-কার্বনেট এবং ২০ গ্রাম গ্লুকোজ থাকে । এই



দ্রব্যগুলি এক লিটার বিশুদ্ধ জলে দ্রবীভূত করা হয়। এইভাবে প্রস্তুত দ্রবণ শরীরে খুব কার্যকরী হয়। এক্ষেত্রে গ্লুকোজ লবণগুলির বাহক হয়। গ্লুকোজ অন্ত্র থেকে লবণ নিয়ে তা রক্তে নিয়ে আসে। এই গ্লুকোজ আবার পাওয়া যায় চিনির আর্দ্র-বিশ্লেষণের দ্বারা। সুতরাং শরীররক্ষায় লবণ ও চিনির গুরুত্ব অপরিসীম। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা যায় যে দেহে লবণের ভারসাম্য একান্ত দরকার, কারণ তা না হলে ক্ষুধামন্দা, বমিভাব দেখা দিতে পারে। রক্তে লবণের ভাগ বেশি হলে হাইপারক্লোরেমিয়া এবং লবণের পরিমাণ কম হলে হাইপোক্লোরেমিয়ার সৃষ্টি হয়। লবণ বেশি খেলে রক্তচাপ বেড়ে যেতে পারে। সেজন্য যাদের রক্তচাপ বেশি তাদের লবণ যতটা কম খাওয়া যায় ততই ভাল। আবার যাদের রক্তচাপ কম তাদের পক্ষে লবণ উপকারী। অবশ্য লবণ বেশি মাত্রায় খাওয়া কখনোই ঠিক নয়। লবণের আবার বিষক্রিয়া আছে, যাকে বলে সল্ট-পয়জনিং। এটি ধরা পড়ে রোগীর রক্ত, প্রস্রাব ও চোখের জল পরীক্ষা করে।

আমাদের জীবনে ক্যালসিয়াম



প্রকৃতির বিচিত্ররূপের সঙ্গে আমরা পরিচিত । কোথাও কোথাও ছোট-বড় পর্বতমালা আর কোথাও কোথাও নদ-নদী, সাগর । এই পাহাড় বা নদী তার রূপ যেমনই হোক না কেন, সেখানে পাওয়া যায় নানা ধরনের মৌল ও যৌগের সন্ধান । এইসব মৌলের মধ্যে একটি প্রধান স্থান দখল করে রেখেছে ক্যালসিয়াম । এটি একটি ধাতু । এই ধাতুর যৌগ পাহাড়ের একটা প্রধান অঙ্গ । সমুদ্রের নানা প্রাণীর মধ্যেও এই ক্যালাসয়াম যৌগের প্রাধান্য । প্রকৃতির সঙ্গে তাই তার এত সখ্যতা, বন্ধুত্ব ।

এই ধাতুটি বিভিন্ন যৌগ গঠন করে । এর একটি প্রধান যৌগ হচ্ছে ক্যালসিয়াম ফসফেট যা আমাদের শরীরে বেশ ভালো পরিমাণে থাকে । এর মূল আকর হচ্ছে ক্যালসাইট । ক্যালসাইট থেকে এটি নিষ্কাশিত হয়েছিল, তাই এর নাম ক্যালসিয়াম । ১৮০৮ সালে বার্জেলিয়াস, পনটিন এবং ডেভি এই মৌলটি আবিষ্কার করেন । চুন, চুনাপাথর, চক প্রভৃতি হচ্ছে ক্যালসিয়ামের যৌগ । সুপার ফসফেট অফ লাইম যা সার হিসাবে ব্যবহৃত হয়, আসলে তা ক্যালসিয়ামঘটিত যৌগ । আমরা যে দুধ খাই তার মধ্যে আছে ক্যালসিয়াম । শরীরে যে সব ধাতব পদার্থ আছে, তার মধ্যে ক্যালসিয়ামের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি (শতকরা প্রায় ২ ভাগ) । শরীরের পুষ্টিসাধনে এর মূল্য খুব বেশি । মানুষ এবং অনেক প্রাণীর হাড় ও দাঁতের গঠনে এর বিশেষ ভূমিকা আছে । প্লাস্টিক শিল্পে বিভিন্ন পদার্থ উৎপাদন করতে নাইট্রোলিম

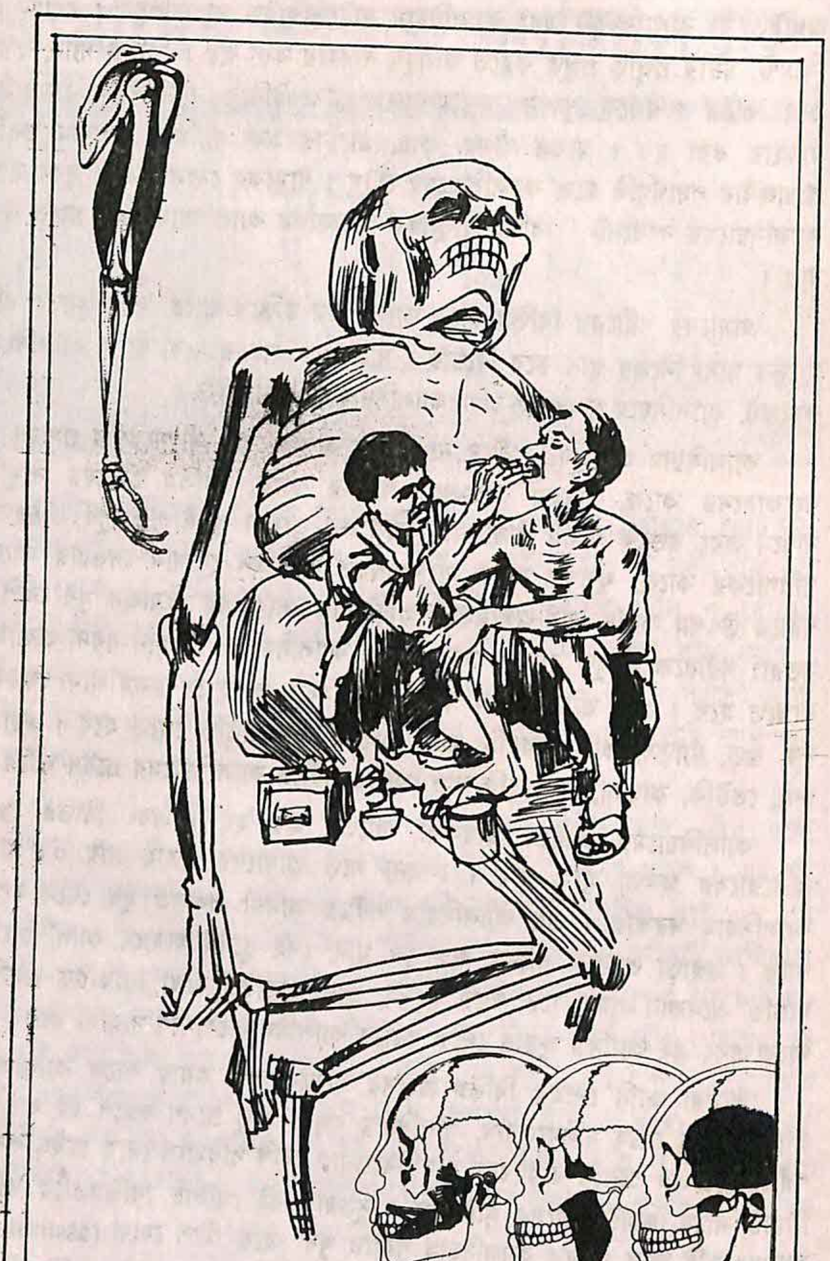
প্রয়োজন হয়। এই নাইট্রোলিম হচ্ছে ক্যালসিয়াম সায়ানামাইড। এটি সার হিসেবেও ব্যবহার করা হয়। ক্যালসিয়ামের দুটি অতি পরিচিত যৌগ হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা বাখারি চুন এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা কলিচুন। পোর্টল্যাণ্ড সিমেন্ট, মর্টার প্রভৃতি প্রস্তুত করতে কলিচুন ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন গ্যাস, তরল এবং কঠিন পদার্থকে শুকনো করার জন্য ল্যাবরেটরিতে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ব্যবহার করা হয়। মার্বল পাথর, কাচ, প্লাস্টার অফ প্যারিস, জিপসাম প্রভৃতি প্রয়োজনীয় পদার্থগুলি হচ্ছে ক্যালসিয়ামের যৌগ। শামুকের খোলটি এবং মুক্তা হচ্ছে ক্যালসিয়ামের কার্বনেট। বিভিন্ন ধাতুশঙ্কর বা অ্যালয় ক্যালসিয়াম দিয়ে প্রস্তুত করা যায়।

আমাদের শরীরের বিভিন্ন স্থানে ক্যালসিয়াম ছড়িয়ে আছে, তবে মূলতঃ এটি হাড়ের মধ্যে নিজের স্থান করে নিয়েছে। দাঁত এবং হাড়ের মধ্যে থাকে ক্যালসিয়াম ফসফেট, ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড।

ক্যালসিয়াম আমাদের শরীরে নানাভাবে কাজ করে। মাংসপেশীর প্রসারণ ও সংকোচনের কাজে, দেহের অস্থিমজ্জা গঠনের কাজে, বিভিন্ন কোষের সংযুক্তি সাধনে এবং রক্তকে জমাট বাঁধানোর কাজে এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া পরিপাকের কাজে, ফুসফুস থেকে মাংসপেশীতে অক্সিজেন যোগান দেওয়ার কাজে, শরীরে উৎপন্ন কার্বন ডাই-অক্সাইডকে তাড়ানোর কাজে এর প্রয়োজন খুব বেশি। সুতরাং শরীরকে মজবুত রাখতে গেলে শরীরে ক্যালসিয়ামের যোগান সর্বদা অব্যাহত রাখতে হবে। আর তাই যে সব খাদ্যে ক্যালসিয়াম আছে সে রকম খাদ্য যেমন— দুধ, গুড়, ঢ্যাঁড়স, কফি, বরবটি, মটর, ডিমের কুসুম প্রভৃতি খেতে হবে। এছাড়া রুই, ভেটকি, কাতলা, কৈ প্রভৃতি মাছ খেলেও শরীরে ক্যালসিয়ামের প্রবেশ ঘটবে।

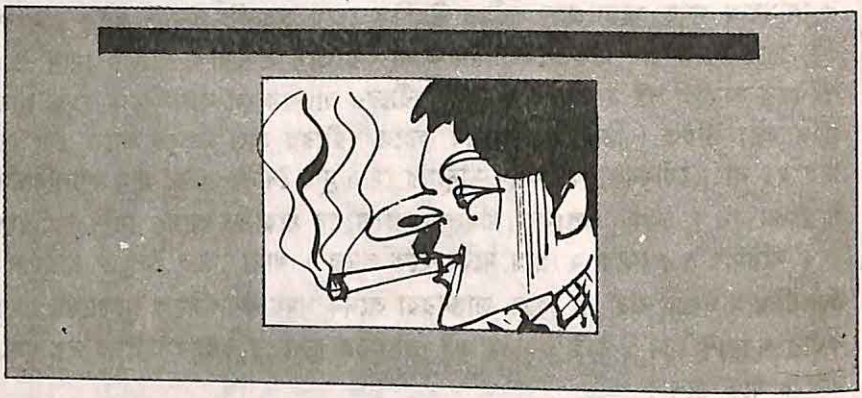
ক্যালসিয়ামের অভাবে অস্থিযক্ষা, দাঁতের ক্ষয় হয়। এবং বিভিন্ন রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতা হ্রাস পায়। সেজন্য গড়ে আমাদের প্রত্যহ প্রায় ০·৫ গ্রাম ক্যালসিয়াম দরকার। এই ক্যালসিয়াম শরীরে আমরা প্রধানত দুধ থেকে পেতে পারি। এছাড়া অনেকে পানের সঙ্গে চুন খান, সেই চুনের মাধ্যমে ক্যালসিয়ামের ঘাটতি অনেকটা পূরণ হতে পারে। দই, ছানা প্রভৃতির মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকে এবং এই অ্যাসিড ক্ষুদ্রান্ত থেকে শরীরে ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে।

আমরা জানি দেহের বিভিন্ন অংশের হাড়কে শক্ত করার কাজে ক্যালসিয়াম লাগে। কিন্তু দেহে মলিবডেনাম, স্ট্রনসিয়াম প্রভৃতি ধাতু প্রবেশ করলে এই ধাতুগুলি শরীরে Ca-এর প্রবেশে বাধা দেয়। মলিবডেনাম বেশি পরিমাণে দেহে প্রবেশ করলে টিয়ার্ট নামে একটি রোগের সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই মৌলটি বিভিন্নভাবে শরীরে ব্যাঘাত সৃষ্টি করে। তবে ক্যালসিয়াম শরীরে খুব সহজে মিশে যেতে (assimilate) পারে না। অম্লতা ও ক্ষারতারও এক বিশেষ ভূমিকা আছে। যখন বেশি পরিমাণ



ফসফেট শোষিত হয় তখন ক্যালসিয়াম ফসফেট উৎপন্ন হয় এবং এটি অম্ল মাধ্যমে দ্রবণীয়। সুতরাং অম্ল মাধ্যম ক্যালসিয়াম গ্রহণে সাহায্য করে। বৃক্কতে ক্যালসিয়াম লবণ যদি জমা হয় তবে সেখানে পাথর সৃষ্টি হতে পারে। তাই প্রসাব পরীক্ষা করে এ ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা যেতে পারে। অনেক সময় বেশি পরিমাণ ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ শরীরে উন্নতির চেয়ে অবনতি ঘটাতে পারে। কারণ এই ক্যালসিয়াম যদি ঠিকভাবে পরিপাক না হয় তবে হৃদরোগ, নার্ভের দোষ এবং শরীরের সাম্যতা নষ্ট হতে পারে। তাই শরীরের বাড়ন্তকালে ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য গ্রহণ করা উচিত। ঠিকভাবে পরিশ্রম করলে শরীরের হাড় মজবুত থাকে এবং তা রুগ্ন হয় না। যৌবনকালে একজন মানুষের মোটামুটি দৈনিক ০.৬ গ্রাম ক্যালসিয়াম প্রয়োজন হয়। একজন অন্তঃসত্ত্বা মহিলার ক্ষেত্রে এর প্রয়োজন আরও বেশি হয় এবং তার পরিমাণ ১.৫ থেকে ২ গ্রাম মতো হতে পারে। খাদ্য থেকে উপযুক্ত পরিমাণ ক্যালসিয়াম সংগ্রহ করা না গেলে, ডাক্তাররা অনেক সময় ক্যালসিয়াম গ্লুকোনেট গ্রহণ করার পরামর্শ দেন। তাই প্রকৃতির এই মৌলটির গুরুত্বের কথা আমাদের সব সময় মনে রাখতে হবে।

শরীরে ধূমপানের প্রভাব



ভারতের লোকসংখ্যা ৮০ কোটি ছাড়িয়ে গেছে। এই জনসংখ্যার একটা বিরাট অংশ কৃষির উপর নির্ভরশীল। দেশে বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠলেও সমস্ত বেকার যুবক-যুবতীর জন্য উপযুক্ত কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা এখনও হয় নি। অনেক লোককে তাই কাজের অভাবে ছোট ছোট কুটির শিল্পের উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকতে হচ্ছে। ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য কুটিরশিল্প হচ্ছে বিড়ি-শিল্প। আমরা জানি ধূমপান স্বাস্থের পক্ষে ক্ষতিকর। এ কথাটি অবশ্য সিগারেটের ক্ষেত্রেই বেশি প্রযোজ্য। আজকাল বিড়ির দিকে অনেক মানুষের ঝোঁক। এটি একটি নেশা। নেশা না মিটলে অনেকে কাজে উৎসাহ পান না। সারাদিন একটা অস্বস্তিবোধ করেন। বিড়ির দাম কম, তাই গরীব মানুষ এটিকে সিগারেটের বদলে নেশা করে নিয়েছে। বর্তমানে বিড়ির রকমফের হয়েছে। তাই সুগন্ধি ও বড় আকারের বিড়ির কদর শুধু এদেশে নয়, বিদেশেও জমে উঠেছে। অনেকে বেশি পরিমাণ মশলার জন্য এবং আরামপ্রদ করার জন্য পাইপের সাহায্য নেন। আমাদের দেশে বহু উচ্চপদস্থ ব্যক্তি লোকসমক্ষে বিড়ি খেতে লজ্জা পান, কিন্তু লুকিয়ে লুকিয়ে তাঁরা তা গ্রহণ করে থাকেন।

১৪৯২ সালে সভ্যজগতের সঙ্গে তামাকের পরিচয় ঘটে এবং সেইসময় আরওয়াক জাতের রেড ইণ্ডিয়ানরা কলম্বাসকে তামাক পাতা উপহার দেয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পর্তুগীজরা ভারতে তামাকের চাষ শুরু করে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

তামাক উৎপাদন সবচেয়ে বেশি। দ্বিতীয়স্থান চীনের এবং তারপরের স্থান ভারতের।

আমাদের দেশে বিড়ির প্রচলন খুব বেশি। সম্ভবত, ১৮৮৭ সালের প্রথমদিকে এই ব্যবসা বেশি সাফল্যলাভ করে নি, কিন্তু বছর কুড়ি পর থেকে এর ব্যবসা বেশ লাভজনক হয়ে ওঠে। গুজরাতী এবং বাঙালীরা বর্তমানে এই ব্যবসায় সাফল্য লাভ করেছে। ঘরের বহু নারী-পুরুষ এখন বিড়ি বেঁধে সংসার চালায়।

বিড়ি-ব্যবসা ঠিকভাবে চালাতে গেলে প্রয়োজন বিড়ির তামাক ও পাতা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে বিড়ির তামাক পাওয়া যায় না বললেই চলে। বিড়ির পাতা বাঁকুড়া থেকে যা পাওয়া যায় তা নিকৃষ্টমানের। গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও কর্নাটকের কয়েকটি জেলায় বিডির তামাক পাওয়া যায়। গুজরাটেই সব থেকে বেশি তামাক উৎপন্ন হয়। পশ্চিমবঙ্গে বিড়ির তামাক হয় না বলে তা আনা হয় গুজরাট ও কর্নাটক থেকে। বিড়ির পাতা এরাজ্যে আসে বিহার, আসাম ও ওড়িশা থেকে। তাই এখানকার তৈরী বিড়ির দাম বেশি হয়ে থাকে।

বর্তমানে সারা ভারতেই বিড়ির ব্যবসা চলছে। বিড়ির জন্য প্রয়োজনীয় কেন্দুপাতার ফলন হয় মধ্যপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও ওড়িশায়। এর মধ্যে ওড়িশার কেন্দুপাতা সবচেয়ে উৎকৃষ্টমানের। কেন্দুপাতা পাহাড়ের কোলে বা ঘন জঙ্গলে উৎপন্ন হয়। আগেকার দিনে তামাক মোড়ার কাগজ উপযুক্ত পাওয়া না গেলে তা কেন্দুপাতা দিয়ে মোড়া হত। দিনে দিনে বন-জঙ্গলের পরিধি ছোট হয়ে আসার ফলে কেন্দুপাতার ফলনও কমে যাচ্ছে। এতে বিড়ি শিল্পে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে।

তামাকের ধোঁয়া মানুষ প্রায় ৩৫০ বছর ধরে ভোগ করে আসছে। তামাক হল একটি ওষধি (herb)। তামাক পাতার মধ্যে থাকে বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ। যেমন শ্বেতসার, সুপার অ্যালকালয়েড (নিকোটিন), হাইড্রোকার্বন, পেপটিক দ্রব্য, স্টেরল ও কিছু অজৈব দ্রব্য। খুব উচ্চ উষ্ণতায় সিগারেটের থেকে বিভিন্ন ধরনের গ্যাস বেরিয়ে আসে। গ্যাসগুলি ফুসফুস ও গলার পক্ষে ক্ষতিকর। তামাক পাতায় যে সব উপক্ষার আছে তার মধ্যে প্রধান হল নিকোটিন। তামাকপাতা প্রধানত বিড়ি, সিগারেট, চুরুট, হুকা'র কাজে লাগে এবং নস্যি তৈরীতে এটি কাজে আসে। এর পাতা ভেজানো জল কীটনাশক হিসেবে কাজে লাগে। তামাক গাছ সোলানসি গোত্রভুক্ত নিকোটিয়ানা টাবাকাম এবং নিডোটিয়ান রাস্টিকা তামাকের জন্য চাষ করা হয়। হুকার তামাক, নস্যি ও গুণ্ডির জন্য রাষ্টিকা জাতীয় তামাক পাতা ব্যবহার করা হয় এবং বিড়ি, সিগারেট ও গুণ্ডি তৈরীর জন্য টাব্যাকাম জাতীয় তামাকের ব্যবহার হয়। এই দুই জাতের তামাকগাছ প্রায় ১ বছর বাঁচে। তামাকের বীজে শতকরা প্রায় ৩৫ ভাগ পরিমাণ তেল থাকে যা ভোজ্যতেল হিসেবে ব্যবহার



করা হয়।

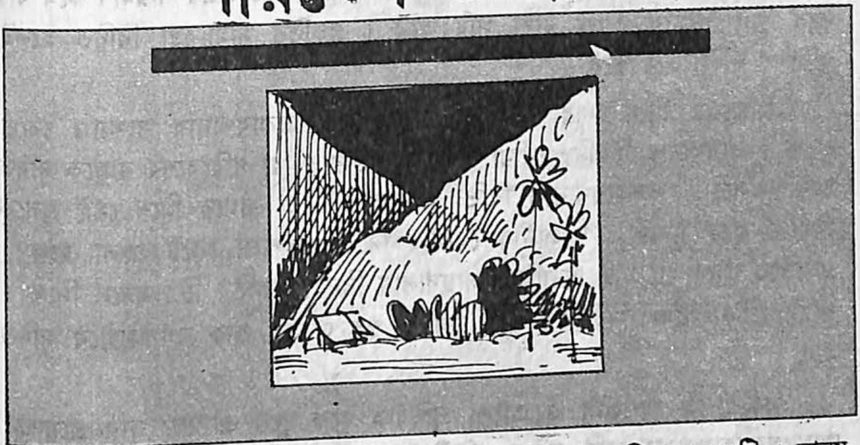
যাঁরা ধূমপান করেন তাঁদের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে তাঁদের স্নায়বিক দৌর্বল্যও তুলনামূলকভাবে সাধারণের চেয়ে বেশি। অতিরিক্ত ধূমপায়ীর চোখের রেটিনারও ক্ষতি হয় এবং অনেক সময় রেটিনার আলোকসংবেদনশীলতা কমে যায়। এছাড়া ধূমপায়ীর শরীর অল্প উত্তেজনায় কাঁপতে দেখা যায়। ধূমপানে যে ফুসফুসেরই ক্ষতি হয় তা নয়, সেই সঙ্গে গলারও ক্ষতি হয়। এতে গলা ভাঙ্গতে পারে, স্বর কর্কশ হতে পারে। অর্থাৎ যাঁরা গান করেন, আবৃত্তি করেন, নাটক করেন তাঁদের ক্ষেত্রে স্বরযন্ত্রের ক্ষতি হওয়াটা বেশিরকম অসুবিধাজনক। তামাকে যে নিকোটিন থাকে তা একটি বিষাক্ত পদার্থ এবং এটিকে মরফিন, আফিং-এর সঙ্গে তুলনা করা চলে। খুব বেশি মাত্রায় এগুলি গ্রহণ করলে মৃত্যুও হতে পারে। কয়েকবছর আগে আমেরিকায় একটি সমীক্ষা করা হয়েছিল নিকোটিনের প্রভাব নিয়ে। সেই সমীক্ষা করা হয়েছিল 'বয়-স্কাডট'দের উপর। এবং তাতে দেখা যায় যে নিকোটিন গ্রহণে হৃৎপিণ্ডের উপর একটা চাপের সৃষ্টি হয় এবং তাতে শরীর অসুস্থ হয়। একটি দণ্ডের উপর দিয়ে কয়েকবার লাফানোর একটি পরীক্ষা করা হয়েছিল এবং তাতে দেখা গেছিল যে যারা ধূমপান করেছিল তাদের অধিকাংশের ক্ষেত্রেই হৃৎপিণ্ড বেশ দ্রুতহারে চলেছিল এবং তা স্বাভাবিক হতে সময়ও বেশি নিয়েছিল। কিন্তু যারা ধূমপান করেনি তাদের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড খুব তাড়াতাড়ি স্বাভাবিক হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং নিকোটিনের ক্ষতিকর দিকটা মনে রেখেই ধূমপান করা উচিত।

আজকাল বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তামাক, বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতির ব্যবহারকে ক্যান্সার সহায়ক বলে বলা হচ্ছে। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে যাঁরা কোন রকম ধূপমান বা তামাক সেবন করেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে গলার ক্যানসার, হৃৎরোগের সম্ভাবনা কম হয়। ফুসফুসের ক্যানসার রোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা এখন ভারত, উত্তর আমেরিকা ও ইন্দোনেশিয়ায় বেশি। তামাকের ধোঁয়ার সঙ্গে নিকোটিন বেরিয়ে আসে এবং শ্বাসনালীতে জমা হয়। কেউ কেউ বলেন যে, এতে সুপ্তাবস্থায় থাকে এমন এক ধরনের জিন জেগে ওঠে। দূষিত বাতাস, সিগারেটের ধোঁয়া প্রভৃতি এই জিনকে কার্যকরী করে তোলে এবং তাতে ক্যানসার দেখা দিতে পারে। অবশ্য যাঁরা জল বারে বারে পান করেন, তাঁদের ক্ষেত্রে ফুসফুসের ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা কমে যায়। বেশি জল পান করলে ধূমপানের নেশা কিছুটা কমে যায় এবং তাতে নিকোটিনের প্রবেশও কমে যায়।

কোন কোন তামাকের মধ্যে বিজ্ঞানীরা পোলোনিয়াম এবং অন্যান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ অল্প পরিমাণে পেয়েছেন এবং সেগুলি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। গর্ভবতী মায়েরা যদি ধূমপান করেন, তবে দেখা গেছে যে তাঁদের শিশুদের ওজন তুলনামূলক ভাবে কম হয় এবং পূর্ণসময়ের আগেই সন্তানের জন্ম হয়।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, তামাক তথা ধূমপানের প্রভাব শরীরের পক্ষে মোটেই ভাল নয়। তাই ধূমপানের ক্ষতিকর দিকের প্রতি আমাদের সবসময় সজাগ থাকতে হবে।

পরিবেশ ও আমরা



প্রকৃতির জল, বায়ু, মাটি ও তার প্রাণিদের নিয়েই পরিবেশের সৃষ্টি। মানুষ, বিভিন্ন প্রাণি এবং উদ্ভিদ – এদের প্রত্যেকেরই ভূমিকা আছে পরিবেশকে সুস্থ ও সুন্দর রাখার। মানুষের সুস্থ মানসিক চিন্তাধারাই পরিবেশকে দূষণমুক্ত করতে পারে। এরজন্য চাই নিখুঁত পরিকল্পনা। এই উদ্দেশ্যেই ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দে গঠিত হয়েছিল সম্মিলিত জাতীয় পরিবেশ প্রকল্প (UNEP)। অল্পসংখ্যক মানুষের বদখেয়ালকে বন্ধ করে সমাজের কলুষতা বন্ধ করা যদিও সম্ভব, কিন্তু বিভিন্নভাবে পরিবেশ যেভাবে দূষিত হয়ে চলেছে তার থেকে মুক্তি কি ভাবে পাওয়া যাবে–তা আজকের দিনে এক বড় সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে।

ভারতের অনেক শহরে দেখা যায় যে অসংখ্য বহুতল বাড়ি সারি দিয়ে নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। প্রতি বাড়ির মধ্যে কোন ফাঁক নেই বললেই চলে। প্রকৃতির আলো হাওয়ার সঙ্গে এইসব বাড়ির বাসিন্দাদের যেন আড়ি। এ ধরনের পরিবেশ থেকে মুক্তি পাওয়া অনেকের পক্ষেই এখন আর সম্ভব নয়। জনবহুল বিভিন্ন শহরের চিত্র একইরকম। এইসব বাড়িগুলিকে আবার কলকারখানার ধোঁয়া অনেক সময় গ্রাস করে নেয়। এ হেন পরিবেশ থেকে মুক্তি পেতে অনেক মানুষ চলে আসেন সমুদ্রতীরে বা পাহাড়ের কোলে। কিন্তু এভাবে তো আর মুক্তি আসে না। তার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশের সৃষ্টি।

বায়ুমণ্ডল নিয়ে যদি বিচার করি, সেখানে নানা গ্যাসের সন্ধান আমরা পাই।

বায়ুতে অক্সিজেনের পরিমাণ শতকরা প্রায় ২০ ভাগ। এই গ্যাস শ্বাস-প্রশ্বাস ও দহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। যদি কোন কারণে এই পরিমাণ বেড়ে যায়, তবে বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে যে সাম্যাবস্থা রয়েছে, তার ব্যাঘাত ঘটবে। অক্সিজেনের পরিমাণ বেশি বাড়লে আগুন সহজে নিভবে না। আবার যদি এর পরিমাণ কমে যায় তবে শ্বাস-প্রশ্বাসের কাজে বাধা সৃষ্টি হবে। প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হলেই পরিবেশ দূষিত হয়ে ওঠে।

আজকের দিনে নগর সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে, কলকারখানার সংখ্যাও বেড়ে যাচ্ছে। কারখানার চিমনির ধোঁয়া, বিভিন্ন গাড়ীর ধোঁয়া পরিবেশের বায়ুকে দূষিত করে ফেলছে। কলকারখানার বিভিন্ন জঞ্জাল নদী বা সাগরে মিশে সেই জলকে বিষাক্ত করে তুলছে। জ্বালানীর যোগান দিতে গাছপালা কেটে ফেলা হচ্ছে। একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি অন্যদিকে গাছপালার বিনাশ প্রকৃতির চিত্র বদলে দিচ্ছে। পারমাণবিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য জল ও স্থল উভয়ই আজ ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে।

সূর্য থেকে যে তাপ ও আলো পৃথিবীর বুকে ছুটে আসছে, তার প্রয়োজন আমাদের কাছে খুব বেশি, নইলে পৃথিবীতে মানুষের বসবাস অসম্ভব হয়ে উঠত। এই সূর্য থেকে যে অতিবেগুনী রশ্মি আসে তাও আবার জীবজগতের পক্ষে ক্ষতিকর। বায়ুমণ্ডলের একটি নির্দিষ্ট স্তরে ওজোন গ্যাস থাকে। সেই ওজন গ্যাস অতিবেগুনী রশ্মি শোষণ করে। সুতরাং এই গ্যাস যতদিন ওই স্তরে পরিমাণমতো থাকবে, ততদিন অতি বেগুনীরশ্মির থেকে জীবজগতের ক্ষতির আশঙ্কা নেই। বায়ুতে ওজোনের পরিমাণ যদি সামান্য পরিমাণ বেড়ে যায়, তবে আমাদের স্বাস্থ্যের ক্ষতি হতে পারে। বিভিন্ন কলকারখানায় বিদ্যুৎ উৎপাদনকালে কখনও কখনও ওজোন গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই অতিরিক্ত ওজোন গ্যাস বিঘ্ন ঘটাতে পারে।

সারা বিশ্বে দিন দিন শিল্পের প্রসার ঘটছে। পরিকল্পনাহীন কলকারখানার প্রসার যত ঘটবে পরিবেশ ততই দূষিত হবে। আমাদের মত গরীব দেশগুলিতে কলকারখানায় পরিবেশ দূষণ রোধের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেই বললেই চলে। এতে ঐ সব কলকারখানার কর্মীরা নানারোগের শিকার হচ্ছে। বিশেষ করে যারা চা, পাট, কয়লা, সীসা, তামা প্রভৃতি শিল্পে কাজ করে, তারা পেটের রোগ ও শ্বাসজনিত রোগে আক্রান্ত হয়। পেট্রোল পাম্পে যারা কাজ করে তাদের অনেকেই – অস্থিমজ্জা ও যকৃতের রোগে আক্রান্ত হয়। এর কারণ গরমের সময় তেলের বাষ্প তাদের শরীরে প্রবেশ করে। বিভিন্ন গাড়ি–যেমন কয়লাচালিত রেলগাড়ি, ডিজেল ও পেট্রোল চালিত গাড়ি, উড়োজাহাজ প্রভৃতির ধোঁয়া বায়ুকে বিষাক্ত করে তোলে। মানুষ যে ধূমপান করে, তার ধোঁয়ায় থাকে নিকোটিন, তা বায়ুকে দূষিত করে। সেই দূষিত বায়ুতে আমরা শ্বাসগ্রহণ করি। এতে শরীরে কার্বনকণা ও ধূলিকণা প্রবেশ করে এবং

ফুসফুসের ক্ষতি হয়। শব্দের মাত্রাও বেশি হলে তা পরিবেশ দূষিত করে। বেশি জোরের শব্দ অনেকের হৃদরোগ ও অত্যধিক রক্তচাপের কারণ হয়ে উঠতে পারে। বিকট শব্দ শিশুদের যথেষ্ট ক্ষতি করে।

বায়ুদূষণ রোধ করতে হলে শিল্পনগরীর দূষিত গ্যাসগুলিকে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে। কলকারখানার চিমনি থেকে যে কার্বন ডাই-অক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, হ্যালোজেন, ধাতব পদার্থ, গন্ধক, কার্বন বেরিয়ে আসে তা বায়ুকে দূষিত করে অর্থাৎ শহরের বায়ুতে অক্সিজেনের শতকরা পরিমাণ কমে যায়। ন্যাশানাল এনভায়রন-মেন্টাল ইঞ্জিনিয়ারিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (National Environmental Engineering Research Institute সংক্ষেপে (NEERI) বিভিন্ন শহরের বায়ুতে গড় সালফার ডাই-অক্সাইড, কার্বন ডাই-অক্সাইড, কার্বন মনোঅক্সাইড – প্রভৃতির পরিমাণ মেপে তার পরিসংখ্যান আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন। এইসব গ্যাসের শতকরা মান যেখানে যেখানে খুব বেশি, সেখানকার লোকদের মধ্যে হাঁপানী, ব্রংকাইটিস, হৃদরোগে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যাও বেশি দেখা যাচ্ছে। বায়ুকে দূষণমুক্ত করতে এই সংস্থা কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা বলেছেন।

(১) শহরের বিভিন্নস্থানে পর্যাপ্ত পরিমাণ গাছপালা বসিয়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড ও ধূলিকণার পরিমাণ কমানো।

(২) কলকারখানায় বেশি সংখ্যক ফিল্টার বা ছাঁকনির ব্যবস্থা করা যাতে অপ্রয়োজনীয় বস্তুগুলি ফিল্টারে আটকে যায়।

(৩) বায়ুর ধূলো ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় বস্তুকে দূর করতে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক প্রতিস্থাপক যন্ত্রের সাহায্য নেওয়া।

(৪) আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে গাড়ীর ধোঁয়া যাতে বায়ুতে না মেশে তার ব্যবস্থা করা।

কলকারখানার ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করতে পারলে এবং জঞ্জাল নদী বা সাগরে মিশতে না দিলে পরিবেশকে অনেকটা ভাল রাখা যাবে। পারমাণবিক বিস্ফোরণ না ঘটানোর দিকে দৃষ্টি দিতে হবে। এখন থেকে দশহাজার বছর আগে সারা পৃথিবীতে লোকসংখ্যা এককোটিরও কম ছিল। কিন্তু দিন দিন তা বাড়তে বাড়তে এখন সে সংখ্যা চারশকোটি ছাড়িয়ে গেছে। সুতরাং এত মানুষকে বেঁচে থাকতে হলে যে পরিমাণ খাদ্য প্রতিবছর লাগবে তার যোগান দেওয়া খুবই চিন্তার বিষয়। তাই কৃষিকার্যের উন্নতির দিকে ব্যাপক নজর দেওয়া হচ্ছে। বিজ্ঞানের কল্যাণে চিকিৎসাশাস্ত্রের উন্নতি ঘটেছে, বহু ওষুধ আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ফলে মানুষের মৃত্যুহার কমেছে। এইসব মানুষ যাতে সুস্থভাবে বাঁচতে পারে তার জন্য চাই উপযুক্ত পরিবেশ।

পরিবেশকে সুস্থ রাখতে গাছ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গাছ বায়ুমণ্ডলের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার চেষ্টা করে। বায়ুর কার্বন ডাই-অক্সাইড সে গ্রহণ করে এবং অক্সিজেন ছাড়ে। বায়ুর মধ্যে ভাসমান ধূলিকণা গাছের পাতায় আটকে যায়। পাতার উপরভাগে যে সব রন্ধ্র থাকে সেগুলি বুজে যায়। এতে গাছের আয়ুও কমে যায়। তবে দেখা গেছে যে গাছ বেশি বছর বাঁচে তাদের পাতার রন্ধ্রগুলি নিচের দিকে থাকে। এতে সেখানে ধূলিকণা জমার সুযোগ কম হয়। পাতার পক্ষে স্বাভাবিক কাজ করে যাওয়া সম্ভব হয়। তবে কলকারখানার কাছে যেখানে অনবরত ধোঁয়া বেরোয়, সেখানে এসব দীর্ঘজীবি গাছের আয়ু কমে যায়। ধূলিকণা পাতার উপর ও নিচে জমা হয় এবং পাতার স্বাভাবিক কাজে ব্যাঘাত ঘটে। তাই গাছপালার পরিমাণ কমে গেলে পরিবেশের ধূলিকণা চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং সেস্থানের মানুষের স্বাভাবিক জীবন ব্যাহত হয়। সুস্থ মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়ে।

মানবসভ্যতার বিকাশ যেদিন থেকে ঘটেছে অর্থাৎ যেদিন থেকে মানুষ আগুন জ্বালাতে শিখেছে, সেদিন থেকেই প্রকৃতির পরিবেশ ব্যাপকহারে পরিবর্তিত হয়েছে। মানুষ আগুন জ্বেলে ডালপালা পুড়িয়েছে এবং তা ছড়িয়ে পড়েছিল ক্রমশঃ। বর্তমানে শুধু গাছের ডালপালাই পোড়ানো হয় না, পোড়ানো হয় লক্ষ লক্ষ টন কয়লা ও অপরিশোধিত তেল। এর ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর তিনভাগের দুইভাগ জল। তাই এই জল কলুষিত হলে জীবন ধারনের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে। বিভিন্ন কলকারখানা থেকে যেসব দূষিত পদার্থ বেরোয়, তাদের মধ্যে বির্ভিন্ন ধাতু ও ধাতুযৌগ থাকে। এই ধাতু বা ধাতুযৌগ বিভিন্ন উপায়ে নদী বা সমুদ্রে মেশে। নদী বা সমুদ্রে 'যেসব অপরিছন্ন তেল মেশে, সেইসব তেল জলকে-দূষিত করে। এই তেলকে বিশুদ্ধ করা যায়—কৃত্রিম ব্যকটিরিয়া দিয়ে। ল্যাবরেটরীতে এই ধরনের ব্যাকটিরিয়াগুলোকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে বহুগুণে বাড়ানো যায় এবং তাতে ব্যাকটিরিয়ার দেয়াল তৈরী হয়। এই ব্যাকটিরিয়ার দেয়াল দূষিত তেলকে শোধন করে দেয়। এই পদ্ধতিটি আবিষ্কার করেন ইলিনয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ আনন্দমোহন চক্রবর্তী।

বম্বে, কলকাতার মতো শহরকে গ্রাস করে আছে কয়েকটন ধূলো, কার্বন মনোক্সাইড, সালফার ডাই-অক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি। ধূলো এবং এই গ্যাসগুলি শরীরের পক্ষে ক্ষতিকর। ভারতের যে সব নদীকে বহুলোক দীর্ঘকাল পূজো করে আসছে, সেইসব নদী বর্তমানে পৃথিবীর কয়েকটি অন্যতম দূষিত নদী বলে জানা গেছে। এইসব নদীর মধ্যে গঙ্গা, যমুনা, দামোদর প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নদী বা সমুদ্রে যে সব আবর্জনা এসে মেশে তাদের মধ্যে তামা, সীসা, কোবাল্ট, পারদ প্রভৃতি ধাতু থাকে। এগুলি নদী বা সমুদ্রের প্রাণীর পক্ষে ক্ষতিকর। নদী বা সমুদ্রের মাছ বা অন্য প্রাণী যখন আমরা খাই, তখন সেগুলি

থেকে আমাদের শরীরে বিষ ঢোকে।

পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে বায়ুতে তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ বেড়ে যায়। সেগুলি বিভিন্নভাবে জলে ও মাটিতে মেশে এবং ফসলের ওপর তার প্রভাব দেখা যায় এবং শরীরে তা প্রবেশ করে। এছাড়া কৃত্রিম রাসায়নিক কীটনাশক পরিবেশকে কলুষিত করছে। জমির ফসল বাঁচাতে এসব কীটনাশক ব্যবহার করা হয়। এই কীটনাশক জলে ধুয়ে পুকুর ও নদ-নদীতে জমা হয় এবং সেই জল আমরা পান করি। যে সব কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করা হয় তার মধ্যে আছে ডি. ডি. ডি., গ্যামাক্সিন, ম্যালাথিয়ন প্যারাথিয়ন প্রভৃতি। সম্প্রতি কিছু কিছু কীটনাশক ব্যবহার করা নিয়ে নিষেধাজ্ঞা জারী করা হচ্ছে। বর্তমানে ডি. ডি. টি. প্রভৃতি বিষাক্ত পদার্থগুলি ব্যবহারে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা হচ্ছে। গ্রামে অনেকে পুকুরপাড়ে জামাকাপড় কাচে। এরজন্য তারা ডিটারজেন্ট পাউডার, সাবান ব্যবহার করে। জামাকাপড়ের ময়লা ও ডিটারজেন্ট জলে মিশে জলকে দূষিত করে তুলছে। পুকুরে গাছের লতা-পাতা পড়ে এবং তা পচে। এই জল অনেকে পান করে এবং তাতে তারা সহজেই রোগের কবলে পড়ে।

পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে রক্ষা করা হলে মানুষকে বিভিন্নভাবে সচেষ্ট হতে হবে। দূষিত পদার্থ ধ্বংস করতে পারে এমন উদ্ভিদ, প্রাণী বা জীবাণুর সংখ্যা বাড়াতে হবে। কলকারখানা সৃষ্টির সময় সেটি কোথায় কিভাবে গড়ে তুলতে হবে সেদিকে নজর দিতে হবে। উপযুক্ত কীটনাশক পরিমাণমতো ব্যবহার করতে হবে। যে সব কীটনাশক বেশি রোগ ছড়ায় সেগুলি ধ্বংস করার ব্যবস্থা করতে হবে। পরিবেশকে মানুষ যাতে স্বেচ্ছায় দূষিত না করে, সেদিকে নজর দিতে হবে। তাই সাধারণ মানুষের মধ্যে সামাজিক চেতনা গড়ে তোলার ব্যবস্থা করতে হবে। চেতনা গড়ে তোলার জন্য জেলায় জেলায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী ও বক্তৃতামালার ব্যবস্থা করতে হবে। কোন মানুষকে বড় করতে যেমন সুস্থ সামাজিক পরিবেশের দরকার, তেমনি সুস্থভাবে বাঁচতে গেলে জীবাণুমুক্ত, ধূলিমুক্ত সুন্দর পরিবেশও দরকার।

জল ও জীবন



জলের আর এক নাম জীবন – একথা আমরা প্রায়ই বলি । কিন্তু কেন ? এর কারণ জল ছাড়া কোন প্রাণীই বাঁচতে পারে না । প্রকৃতি আমাদের প্রতি সদয়, তাই পৃথিবীর চারভাগের তিনভাগই শুধু জল । জলের প্রয়োজন যে কতভাবে হয়, তা ব্যাখ্যা করা সহজ নয় । ১৭৮১ সালে জলের সম্বন্ধে প্রথম বৈজ্ঞানিক ধারনা পাওয়া গেল ক্যাভেনডিশের কাছ থেকে । তিনি দেখান যে, একই উষ্ণতা ও চাপে দুই আয়তন হাইড্রোজেন ও এক আয়তন অক্সিজেন নিয়ে জল গঠিত হয় । ১৭৮৫ সালে এই মতকেই সমর্থন করলেন বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়র ।

মানুষের দৈহিক ওজনের দুই তৃতীয়াংশই হচ্ছে জল । সুতরাং জলের অভাবে শরীরের ওজন কমে যায় এবং এই অভাবের পরিমাণ খুব বেশি হলে মানুষের মৃত্যু হয় । খাদ্যাভাবে বেশ কয়েকদিন বেঁচে থাকা সম্ভব হলেও জলের অভাবে কিন্তু মানুষ অল্প সময়েই মারা যায় । প্রাণিদেহে জলের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে । এক, জল কলাকোষ গড়ার কাজে ও কোষের আকৃতি বজায় রাখার কাজে একান্ত প্রয়োজন । দুই, এটি প্রাণিদেহে পরিবহণ মাধ্যম হয়ে কাজ করে । কলাকোষের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন লাভ করে এবং উৎপন্ন ত্যজ্য পদার্থ বের করতে পারে । তিন, এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দ্রাবক হিসাবে কাজ করে । বিভিন্ন তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য এর মধ্যে ভাঙে এবং তড়িদ্‌বিশ্লেষ্য নয় এমন অনেক জিনিস যেমন ভিটামিন, শর্করা, এনজাইম প্রভৃতি এতে দ্রবীভূত হয় । জলের মাধ্যমে প্রাণিদেহের

প্রায় সকল বিক্রিয়াই ঘটে থাকে। চার, শরীরের উষ্ণতা নিয়ন্ত্রণেও এর ভূমিকা যথেষ্ট। পাঁচ, শরীরের তরল পরিবেশের সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।

শরীরের মধ্যে জলের পরিমাণ পুরুষ ও নারীর মধ্যে বিভিন্ন হয়। পুরুষের দৈহিক ওজনের যেখানে শতকরা ৬০ ভাগ জল নারীর ক্ষেত্রে সেখানে জলের পরিমাণ ৫০ ভাগ। ৬০ ভাগ কিলোগ্রাম ওজনের একজন লোকের দেহে প্রায় ৩৬৩৭ লিটার জল থাকে। দেহের মধ্যে এই জলের সঙ্গে বিভিন্ন উপাদান মিশে থাকে। দেহের মধ্যে এই জলীয় দ্রবণকে দেহতরল বলে। এই দেহতরল কোষের মধ্যে এবং কোষের বহির্দেশে বিস্তৃত থাকে। কোষের মধ্যে যে তরল থাকে তার নাম অন্তঃকোষীয় তরল এবং কোষের বহির্দেশের তরলের নাম বহিঃকোষীয় তরল। দেহের বিভিন্ন কলাকোষে জলের পরিমাণ বিভিন্ন। যেমন, পেশী দৈহিক ওজনের ১০০ ভাগের ৪২ ভাগ হলে, তাতে জল থাকবে শতকরা ৭৬ ভাগ। রক্তে জলের ভাগ আরও বেশি। রক্ত শরীরের ১০০ ভাগের ৮ ভাগ ওজন হলে, তাতে জল থাকবে শতকরা ৮৩ ভাগ। মস্তিস্ক দৈহিক ওজনের ১০০ ভাগের ২ ভাগ হলে জলের ভাগ শতকরা ৭৫ ভাগ হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, জলের পরিমাণ বিভিন্ন দেহকলায় বিভিন্ন কিন্তু দেহের মোট দেহতরলের পরিমাণ মোটামুটি একই থাকে। শরীরে জলের গ্রহণ ও বর্জন প্রায় সর্বদাই ঘটছে কিন্তু দেহতরলের পরিমাণ একইরূপ থাকছে। জলগ্রহণের পরিমাণ বর্জন বা রেচনের চেয়ে বেশি হলে, দেহে জলের পরিমাণ বেড়ে যায়। ঠিক তেমনিভাবে রেচনের পরিমাণ গ্রহণের থেকে বেশি হলে দেহে জলের ঘাটতি হয়। জলের পরিমাণ বেড়ে গেলে ধনাত্মক জলসাম্যে এবং জলের ঘাটতি হলে ঋণাত্মক জলসাম্যে মানুষ থাকে।

ধনাত্মক ও ঋণাত্মক জলসাম্যের অনেক কারণ আছে। যে-সব অবস্থায় মানুষ ধনাত্মক জলসাম্যে থাকে তার মধ্যে আছে গর্ভাবস্থা, শৈশবের ক্রমবৃদ্ধি, যে-সব খাদ্যে শরীর শীর্ণ হয় তা গ্রহণ, খাদ্যে স্নেহজাতীয় পর্দাথের বদলে প্রোটিন গ্রহণ ইত্যাদি। আবার মানুষ তখনই ঋণাত্মক জলসাম্যে থাকে যখন দেহ আগুনে পুড়ে যায়, দেহ থেকে রক্তপাত ঘটে, ঘামের জন্য শরীরে জলের ক্ষয় হয়। এছাড়া, বহুমূত্র, মধুমেহ প্রভৃতি রোগের জন্যও মানুষ ঋণাত্মক জলসাম্যে থাকে।

জল গ্রহণ ও বর্জন করার ব্যাপারেও কিছু জেনে রাখা আবশ্যক। মানুষ বিভিন্ন উৎস থেকে জল গ্রহণ করে থাকে এবং বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় তা শরীর থেকে বের করে দেয়। যে-সব উৎস থেকে জল শরীরে আসে তাদের মধ্যে আছে পানীয় হিসেবে জল, দুধ, সরবৎ, চা, কফি, কোহল প্রভৃতি। এছাড়া মাছ, মাংস, ডাল, ভাত, ফল প্রভৃতি থেকেও জল শরীরে যায়। খাদ্যের ফ্যাট, প্রোটিন, কার্বহাইড্রেটের জারণ প্রক্রিয়াতেও জল সামান্য পরিমাণে উৎপন্ন হয়। সাধারণভাবে দেখা গেছে প্রতিদিনের জন্য প্রয়োজনীয় গৃহীত জল ২০০০ থেকে ৩০০০ মিলিলিটারের মধ্যে থাকে। মানুষের



বয়স, শারীরিক কাঠামো ও আবহাওয়ার ওপর এই জলের পরিমাণ নির্ভর করে। উষ্ণ অঞ্চলে জলের প্রয়োজন বেশি হয়ে থাকে। দৈনিক জল গ্রহণের হিসেবটা মোটামুটিভাবে এইরূপ দাঁড়ায়। পানীয় জল ১২০০ মিলিলিটার, খাদ্যনিহিত জল ১০০০ মিলিলিটার এবং দেহের জারণ প্রক্রিয়ায় ৩০০ মিলিলিটার।

জলপানের ব্যাপারে অনেক ডাক্তারের মত হচ্ছে যে, খাওয়ার পরই অর্থাৎ দুপুর বা রাতের খাওয়ার পরই বেশি পরিমাণ জল খাওয়া উচিত নয়, কারণ খাওয়ার পরই পাচকরস নিঃসৃত হতে থাকে। খাদ্য তখন ক্ষুদ্র হয়ে গিয়ে হজম হয়। জল বেশি পান করলে পাচকরস লঘু হয়ে যায়। তার ফলে খাদ্যবস্তু হজম হতে বেশি সময় নেয়।

সুতরাং খাওয়ার বেশ কিছুক্ষণ পরে জল খাওয়া প্রয়োজন। অন্ততপক্ষে এক থেকে দেড় ঘন্টা পরে জল খেলে ভাল হয়। কিছু সময় ছেড়ে জল পান করলে সেই সময়ে খাদ্য অনেকটা হজম হয়ে যায় এবং সেই খাদ্য জলের সঙ্গে মিশে অন্ত্রে ভালোভাবে শোষিত হয়। খাওয়া শেষ করার পরই একটু জল মুখের মধ্যে নাড়িয়ে গিলে ফেলা ভাল। কারণ, তাতে জিভের লালা সহজে খাদ্যনালীতে-যেতে পারে এই লালা শর্করা হজম করতে সাহায্য করে। কিন্তু জলপানের ব্যাপারে এই মতের বিপরীত মত দিয়েছেন বার্চ, স্পেন্সার এবং ক্যামেরনের মত বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা বলেছেন, খাবার আগে বা পরে যখনই জল পান করা হোক না কেন তাতে কিছু যায় আসে না।

ঘুম ভাঙ্গার পর মুখটি ধুয়ে নিয়ে ৫০০ মিলিলিটারের মত জল পান করলে, পাকস্থলীর অজীর্ণ খাদ্য অনেকাংশে দ্রবীভূত হয় এবং পাকস্থলীর ঘন অম্লরস লঘু হয়ে যায়। এতে মলত্যাগের প্রবণতা বাড়ে এবং শরীর সুস্থবোধ হয়। অনেকে চা-পানের পরে জল গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। এর পেছনে তাঁরা যুক্তি দেখিয়েছেন যে, চায়ের মধ্যে যে কেফিন নামে রাসায়নিক পদার্থ থাকে তা লঘু হয়ে যায়। কেফিন দেহে শক্তি উৎপন্ন করে। জলপানের ফলে এটি লঘু হয়ে যায় বলে এটি যে পরিমাণ শক্তি উৎপন্ন করতে পারত তা করতে পারে না।

জলগ্রহণের ব্যাপারটা মোটামুটি জানা গেল। এবার জলরেচন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা জানা যাক। দেখা গেছে উষ্ণ আবহাওয়ায় জলের রেচন বেশি হয় অর্থাৎ উষ্ণ অঞ্চলে জলত্যাগের প্রবণতা বাড়ে। প্রতিদিন ৩০০০ মিলিলিটার জল দেহ থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। স্বেদক্ষরণ বা ঘামের মাধ্যমে এই রেচন বেড়ে যায়। বেশি ঘাম হলে মূত্র উৎপাদনও কমে যায়। বেশি পরিশ্রম করলে আবার ঘাম বেশি হয়। এইভাবে শরীর থেকে প্রচুর জল বেরিয়ে যায়। ফুসফুসের মধ্য দিয়েও জল প্রচুর পরিমাণে বেরিয়ে যায়। গড় হিসেবে দৈনিক জলের রেচন মূত্রে ১৪০০ মিলিলিটার, মলে ২০০ মিলিলিটার, ত্বক ও ফুসফুসের মাধ্যমে ৮০০ মিলিলিটার ও স্বেদক্ষরণে ১০০

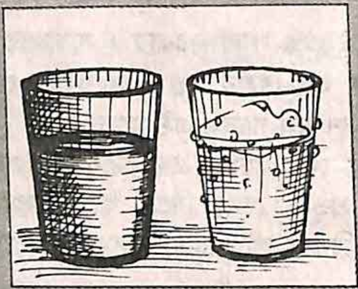
মিলিলিটার হয়ে থাকে।

জলসাম্যের নিয়ন্ত্রণ কিরূপে হয় তাও জানা দরকার। এর পেছনে যে-সব কারণ আছে তাদের মধ্যে প্রধান প্রধানগুলি হল, এক, দেহে জলের অভাব হলে জলের তৃষ্ণা পায় এবং সেজন্য জল খেয়ে তা পূরণ করতে হয়। দুই, আর্দ্রতা ও বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বাড়লে দেহ থেকে জল বেরিয়ে যায়। তিন, জলসাম্য ঠিক রাখার পেছনে বৃক্ক বা কিডনির ভূমিকা খুব বেশি। দেহে জলের পরিমাণ বাড়লে মূত্রের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং জলের পরিমাণ কম হয়। এ ছাড়াও কয়েকটি কারণ আছে। এই কারণগুলির পেছনে তড়িদ্-বিশ্লেষ্য খাদ্য, হাইপোথ্যালামাস ও অন্তঃক্ষরা গ্রন্থির ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ।

জলমত্ততা কিভাবে হয় তাও জানা দরকার। সাধারণত জলমত্ততা দেখা দেয় তখনই যখন প্রচুর পরিমাণ জল শিরার মধ্য দিয়ে শরীরে ঢোকান হয়। এ ছাড়া খুব তাড়াতাড়ি বেশি পরিমাণ জল পানেও এই মত্ততা দেখা দিতে পারে। সাধারণত স্নায়ুগত কারণেই জলমত্ততা দেখা দেয়। পেশীদৌর্বল্য, অন্ত্রপাকাশয়ের বিপর্যয় বা চলাচলের অস্বাভাবিকতা প্রভৃতি দেখা দিতে পারে জলমত্ততার ফলে। সমগ্র দেহকোষের বিপাকক্রিয়ার বিপর্যয় ঘটলেও এই জলমত্ততা দেখা দেয়।

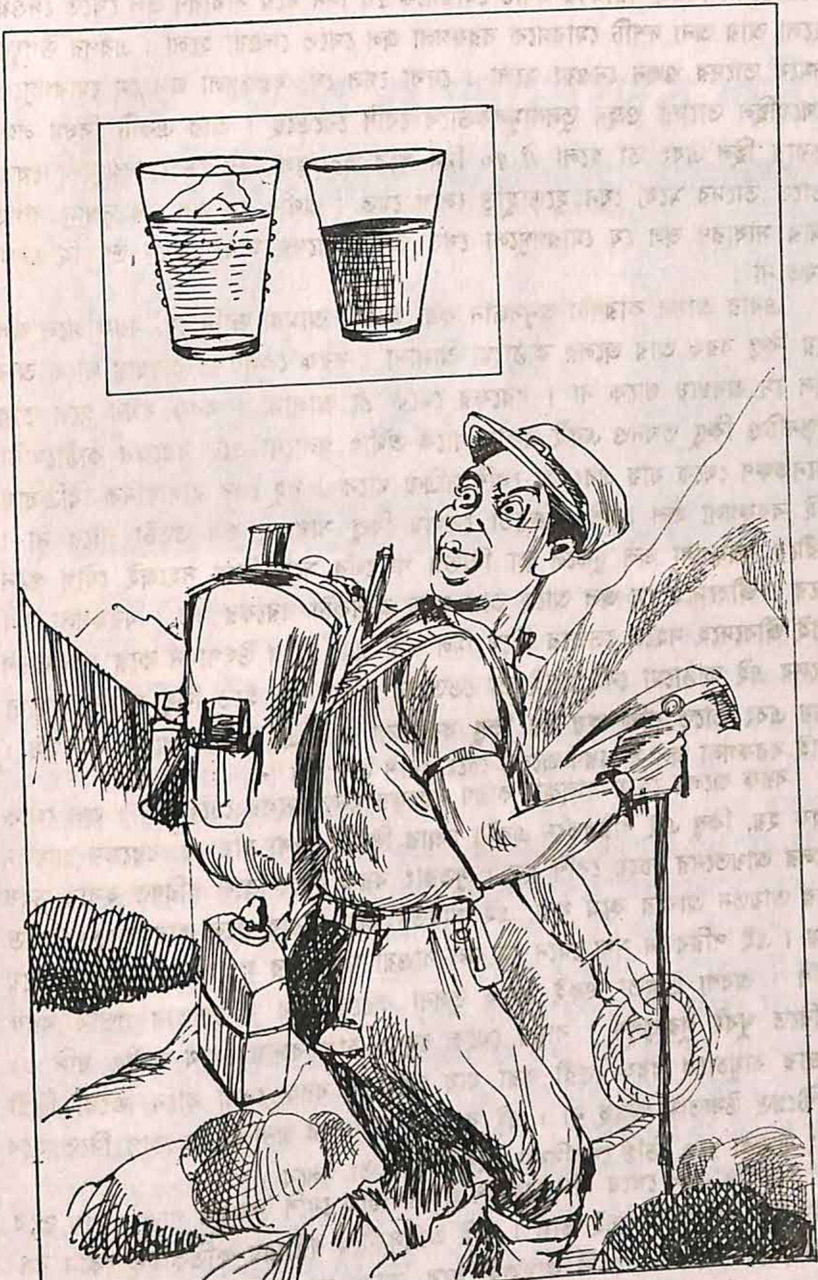
দেহের ত্বক পরিস্কার রাখার জন্য শীতল জলে স্নান করা প্রয়োজন। শীতল জলে স্নান করলে দেহের তাপ অনেক কমে যায় এবং শরীরে স্নিগ্ধতা আসে। গরম জলের প্রয়োজনও শরীরে একান্ত আবশ্যক। বাতজনিত মাংসপেশীর ব্যথায় গরম জলের সেক একান্ত প্রয়োজন। শীতকালে উষ্ণজলে স্নান আরামদায়ক। অনেক রোগের উপশমের জন্য জলচিকিৎসা বা হাইড্রোপ্যাথীর সাহায্য নেওয়া হয়।

সাধারণ জল, বরফগলা জল ও স্বাস্থ্য



জল পান করার প্রয়োজনীয়তা আমরা জানি। আর এই জল পানের কিছু কিছু নিয়মও আছে। শরীরে কতটা জল দরকার, সেই বুঝে জল পান করতে হয়। জল পানের ওপর সুস্বাস্থ্যও নির্ভর করে। সুস্বাস্থ্য বেঁচে থাকার পক্ষে একান্তই প্রয়োজন। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় নিজে খুব কৃশ ছিলেন, কিন্তু তিনি স্বাস্থ্য সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। দেশবাসীকে তিনি এ বিষয়ে কিছু মূল্যবান উপদেশও শুনিয়েছেন। 'স্বাস্থ্য সুস্থ না থাকলে তার বিদ্যাবুদ্ধি, শিক্ষাদীক্ষা কোন কিছুই কাজে লাগে না, স্বাস্থ্যহীন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবন ব্যর্থ তো বটেই, তাঁর পারিবারিক ও সামাজিক জীবনও খুব সুখপ্রদ হয় না। সমাজের দায়স্বরুপ বলে সে চিহ্নিত হয়।' এই কথাগুলো শুধু আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র কেন, সব মানুষই মর্মে মর্মে অনুভব করেন।

যাঁদের বাড়িতে ফ্রিজ আছে, তাঁরা অনেকেই হয়ত ডিপফ্রিজ থেকে বরফের টুকরো মুখে দেন। আর বাড়ির ছেলেমেয়েরা তো দেখা যায় বরফ টুকরো খেতে বেশি ভালবাসে। এবার যদি তাদের বলা যায় যে, সাধারণ জলের চেয়ে বরফগলা জল বেশি উপকারী তবে তারা তো বটেই যারা বরফ খায় না তারাও হয়ত এটি খেতে শুরু করবে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বরফগলা জল বেশি সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যের পক্ষেও বেশি উপযোগী।



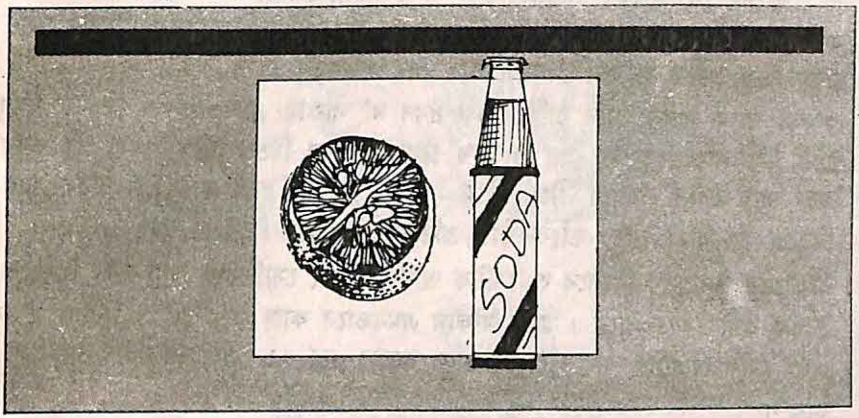
সাধারণ জল ও বরফগলা জল নিয়ে বিজ্ঞানীরা একটি পরীক্ষা নিরীক্ষা করেছিলেন। এই পরীক্ষায় দশটি মোরগকে ৫০ দিন ধরে সাধারণ জল খেতে দেওয়া হলো আর অন্য দশটি মোরগকে বরফগলা জল খেতে দেওয়া হলো। এরপর উপযুক্ত সময়ে তাদের ওজন নেওয়া হলো। দেখা গেল যে, বরফগলা জল যে মোরগগুলো খেয়েছিল তাদের ওজন তুলনামূলকভাবে বেশি বেড়েছে। আর একটি বিষয় লক্ষ্য করার ছিল এবং তা হলো ঐ ৫০ দিন ধরে বরফগলা জল যে মোরগগুলো খেত, তাতে তাদের মধ্যে যেন হুড়োহুড়ি লেগে যেত। অর্থাৎ সে জল খুব সুস্বাদু লাগত আর সাধারণ জল যে মোরগগুলো খেত তাতে তাদের মধ্যে তেমন উৎসাহ দেখা যেত না।

এবার আসল কারণটা অনুসন্ধান করা যাক। আমরা জানি যে, বরফ গলে জল হয় কিন্তু বরফ আর জলের কাঠামো আলাদা। বরফ কেলাসিত অবস্থায় থাকে আর জল সে অবস্থায় থাকে না। বরফের থেকে তা আলাদা। বরফ যখন গলে তার গড়নটিও কিন্তু তখনও একই প্রকার থাকে অর্থাৎ গলানো জলে বরফের কাঠামোটা অনেকক্ষণ থেকে যায় এবং তা বেশি সক্রিয় থাকে। বহু জৈব রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই বরফগলা জল বেশি সক্রিয়তা দেখায় কিন্তু সাধারণ জল ততটা পারে না। শরীরে বরফগলা জল ঢুকলে তা বিভিন্ন পদার্থের সঙ্গে মিশে সহজেই যৌগ গঠন করে। জীবদেহে যে জল আছে তার গড়ন অনেকটা বরফের মত। বরফগলা জল তাই জীবদেহে সহজে ভেতরে গিয়ে মিল খায় এবং যৌগ উৎপাদন করে। সাধারণ জলের এই কাঠামো নেই, তাই তা ভেতরের জলের মত হতে কিছু শক্তির সাহায্য নেয় এবং তাতে শক্তি ক্ষয় হয় কিন্তু বরফগলা জলে এই ক্ষয়টা অনেক কম হয়। তাই বরফগলা জল সাধারণ জলের চেয়ে বেশি উপকারী।

বরফ জলের চেয়ে হাল্কা, কারণ বরফের ঘনত্ব জলের চেয়ে কম। জল থেকে বরফ হয়, কিন্তু এই পরিবর্তনে একটা মজার জিনিস দেখা যায় যে, বরফের আয়তন জলের আয়তনের চেয়ে বেশি হয়। সুতরাং বরফ থেকে জলে পরিণত হবার সময় তার আয়তন আবার কমে যায়, এই আয়তন কমে যাবার ফলে তার ঘনত্বও বেড়ে যায়। এই পরিবর্তন সদ্য মেনে যে জল পাওয়া যায় তার গুণ সাধারণ জলের চেয়ে বেশি। অবশ্য উষ্ণতা একই রেখে তুলনা করতে হবে। উষ্ণতার প্রভাব বরফ তৈরিতে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বায়ুর থেকে বহুগুণ চাপ বজায় রেখে অর্থাৎ যদি ৩২ হাজার বায়ুচাপে বরফ তৈরী করা যায় তবে সে বরফ দেখা যাবে জিরো ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড উষ্ণতায় গলছে না। এই বরফকে গলানোর জন্য অনেক তাপ দিতে হবে এবং উষ্ণতা ১৯২ ডিগ্রি সেলসিয়াস হবে তখনই তা গলবে।

বরফগলা জল খেয়ে যদি সাধারণ জলের চেয়ে বেশি উপকার পাওয়া যায় তবে আইসক্রীম খাওয়া নিশ্চয়ই ভাল। তাই আইসক্রীমে শরীরের ক্ষতিকারক কোন রঙ না লাগিয়ে খেলে তা বেশি কার্যকরী হবে, কারণ বরফগলা জলে থাকছে বরফের গঠন কাঠামো। এই বরফগলা জল নিয়ে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করলে আরো অনেক তথ্য হয়তো ভবিষ্যতে ধরা পড়বে।

অম্ল, ক্ষার ও আমাদের শরীর



বেঁচে থাকতে হলে আমাদের খেতে হবে, একথা সকলেই অনুভব করতে পারি। না খেয়ে কিছুদিন হয়ত চালানো যায়, কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময়ের পর খাদ্যের অভাব মানুষকে জীব-জগৎ থেকে জড়-জগতে পৌছে দেয়। আমরা যে সব খাদ্য গ্রহণ করি, তা খেতে বিভিন্ন স্বাদের হয়। কোনটা টক, কোনটা মিষ্টি, কোনটা ঝাল, কোনটা নোনতা প্রভৃতি। কিন্তু এই স্বাদটাই বড় কথা নয়, সে সব খাদ্য শরীরে গিয়ে অম্ল বা ক্ষারের উৎপত্তি ঘটায়। উৎপন্ন অম্ল বা ক্ষার রক্তের সঙ্গে মিশে তার অবস্থা পাল্টাতে চেষ্টা করে। রক্তের এই অবস্থাকে pH (অম্ল বা ক্ষার গাঢ়ত্বের বিশেষ মাপ) মানের সাহায্যে বোঝান হয়। সাধারণভাবে কোন দ্রবণে হাইড্রোজেন আয়নের তীব্রতার পরিমাপসূচক সংখ্যাকে পি. এইচ বলা হয়। বিশুদ্ধ জলের ক্ষেত্রে ২৫° সেঃ উষ্ণতায় এই পি. এইচের মান সাত। বিশুদ্ধ জলে অ্যাসিড বা ক্ষারের ধর্ম প্রকাশ পায় না। যে কোন প্রশমিত দ্রবণের পি. এইচের মান সাত। সাত এর বেশি pH হলে কোন দ্রবণ ক্ষারীয় হয় এবং সাত এর কম pH হলে দ্রবণ আম্লিক হয়। রক্তের pH ৭.৩৩ থেকে ৭.৪৫ এর মধ্যে থাকে। অর্থাৎ যে কোন সময় শরীরের রক্ত সামান্য ক্ষারীয় অবস্থায় থাকে। রক্তের pH এই মানের বাইরে গেলে মানুষের ধনুষ্টঙ্কার হতে পারে বা তার মৃত্যু হতে পারে। রক্তের pH- এর এই মান ০.৪ একক এধার ওধার হলেও শরীরে উপস্থিত প্রয়োজনীয় উৎসেচকগুলির অনেক সময় কার্যক্ষমতা নষ্ট হয়ে যায়। মধুমেহ রোগে (Diabetes) যকৃতে কিটোন

পদার্থ উৎপন্ন হয় এবং এই কিটোন উৎপাদনকে কিটোসিস বলে। এই কিটোসিস বন্ধ করা যায় যদি ইনসুলিন ইনজেকশন নেওয়া যায় এবং তাতে রক্তের অম্লদশা দূর হয়।

রক্তের pH যাতে পরিবর্তিত না হয় তার জন্য দেহের মধ্যে বিশেষ ব্যবস্থা করা থাকে। এর জন্য কিছু রাসায়নিক পদার্থ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। যখন কোন দ্রবণে অম্ল, ক্ষার বা জল মেশালে তার pH পরিবর্তন রোধ করার কিছু পরিমাণ ক্ষমতা থাকে তখন তাকে প্রতিরোধক দ্রবণ বা বাফার দ্রবণ বলে। বাফার দ্রবণ তৈরী হয় সাধারণত মৃদু অম্ল ও তার কোন লবণের মিশ্রণ দিয়ে অথবা মৃদু ক্ষার এবং তার কোন লবণের মিশ্রণ দিয়ে। কোন বাফার দ্রবণ তার pH পরিবর্তনের বিরুদ্ধে যে বাধা দেয়, তাকে তার প্রতিরোধক ক্রিয়া (Buffer action) বলে। বাফারের উদাহরণ হিসেবে অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং সোডিয়াম অ্যাসিটেট মিশ্রণকে উল্লেখ করা যেতে পারে। রক্তে বাফার এমনভাবে কাজ করে যে, ১ লিটার রক্তে ০.০১ মোল NaOH বা HCl মেশালে রক্তের pH ০.১ এককের বেশি উঠানামা করে না।

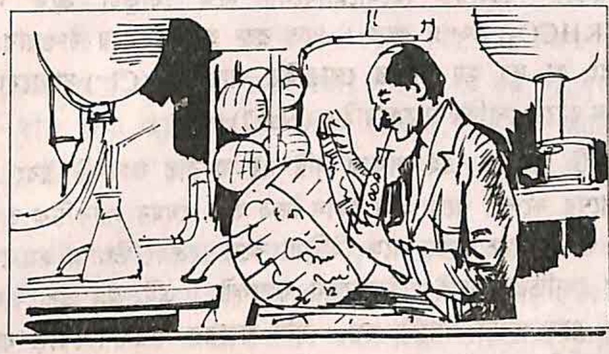
রক্তে বাফার কিভাবে কাজ করে-

রক্তে বাফার হচ্ছে একটি মৃদু অম্ল এবং তার লবণের মিশ্রণ। রক্তে যেসব বাফার থাকে সেগুলি হচ্ছে (১) বাইকার্বনেট বাফার (১) হিমোগ্লোবিন বাফার (১) ফসফেট বাফার এবং (৪) প্রোটিন বাফার।

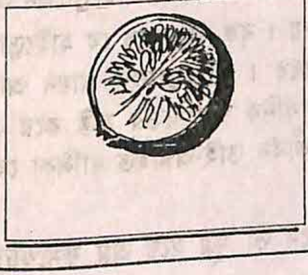
বাফারগুলির গঠন এবং কিভাবে তারা কাজ করে একে একে সংক্ষেপে তা জানা যাক, যদিও রক্তে বাফারের কাজ নিয়ে এখনও গবেষণা চলছে। যখন কোন খাদ্য শরীরে অম্ল বা ক্ষার সরবরাহ করে, তখন এই সব বাফার সেই অম্ল বা ক্ষারকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং রক্তের pH মানকে স্বাভাবিক রাখে।

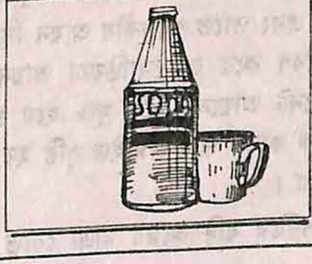
১. **বাইকার্বনেট বাফার**–কার্বনিক অ্যাসিড বিশ্লেষিত হয় হাইড্রোজেন আয়ন এবং বাইকার্বনেট আয়নে। উৎপন্ন বাইকার্বনেট আয়ন তখন অ্যাসিডের সঙ্গে থেকে বাফারের কাজ করে। কোন খাদ্যের ল্যাকটিক অ্যাসিড শরীরে প্রবেশ করলে তার সঙ্গে শরীরের সোডিয়াম বাইকার্বনেট ক্রিয়া করে। বিক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম ল্যাকটেট এবং কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। এই কার্বনিক অ্যাসিড আবার ভেঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন করে এবং গ্যাসটি ফুসফুসের সাহায্যে বেরিয়ে যায়। সুতরাং বাফার ল্যাকটিক অ্যাসিডের প্রভাবকে এইভাবে নষ্ট করে দেয়। ক্ষারীয় দ্রব্য আহারের ফলে রক্তে ক্ষারের পরিমাণ আরো বাড়ে এবং সেই ক্ষার গৃহীত খাদ্যের অম্লকে প্রশমিত করে।

২ হিমোগ্লোবিন বাফার–লাল রক্তকণিকায় হিমোগ্লোবিন দুই অবস্থায় দুই









রকম বাফারের কাজ করে। রক্ত যখন শরীরে প্রবাহিত হয় তখন কার্বন ডাই-অক্সাইড লাল কণিকার ভেতর ঢোকে এবং সেখানে কার্বনিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। এই অম্ল ক্ষারকীয় বিজারিত হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে পটাসিয়াম বাইকার্বনেট ($KHCO_3$) উৎপন্ন করে। এতে রক্ত ক্ষারীয় হয়ে যাওয়ার প্রবণতা লাভ করে এবং তা দূর হয় শরীরে ক্লোরাইড আয়নের (Cl^-) সাহায্যে। এই ক্লোরাইড আয়ন আসে সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl) থেকে।

৩. **ফসফেট বাফার**–এই বাফার সৃষ্টি হয় ক্ষারীয় ফসফেট এবং অ্যাসিড ফসফেটের মিশ্রণের ফলে। রক্তে যদি কোন জৈব অম্ল (যেমন ল্যাকটিক অম্ল) বেড়ে যায় তখন তা ক্ষারীয় ফসফেটের সঙ্গে বিক্রিয়া করে। এবং উৎপন্ন হয় সোডিয়াম ল্যাকটেট এবং সোডিয়াম ডাই-হাইড্রোজেন ফসফেট। এই অম্ল প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে যায়। এতে প্রস্রাব আম্লিক হয়। যদি ক্ষারের পরিমাণ বেড়ে যায়, তবে বিক্রিয়ায় ডাই সোডিয়াম হাইড্রোজেন ফসফেট উৎপন্ন হয় এবং তা প্রস্রাবের মাধ্যমে বেরিয়ে যায় এবং তখন প্রস্রাব ক্ষারীয় হয়।

৪. **প্রোটিন বাফার**–আর এক ধরনের বাফার হচ্ছে প্রোটিন বাফার। এটি হল Na^+ প্রোটিনেট / H^+ প্রোটিনেট। এটিও শরীরের রক্তের pH -কে সাম্যাবস্থায় রাখার চেষ্টা করে। তবে এই বাফার সাধারণত খুব একটা বড় ভূমিকা নেয় না।

ফুসফুসের ভূমিকা–শরীরে অম্লের মাত্রা দূর করতে গিয়ে প্রচুর কার্বন ডাই-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড ফুসফুসের সাহায্যে বেরিয়ে আসে। কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে যাওয়ার পর রক্তের pH একটা নির্দিষ্ট মানে ফিরে আসে। সুতরাং ফুসফুসের ভূমিকা শরীরের অম্ল-ক্ষারের মধ্যে খুব বেশী। দেখা গেছে, রক্তের pH কমলে, ফুসফুসের কাজ বেড়ে যায়। আবার pH বাড়লে ফুসফুসের কাজ ধীর হয়ে যায়। শ্বাস-প্রশ্বাসের গতি কমে গেলে কিছু কার্বন ডাই-অক্সাইড শরীরে থেকে যায় এবং তাতে শরীরের pH ঠিক থাকে।

বৃক্ক বা কিডনীর ভূমিকা–অম্ল বা ক্ষারের মধ্যে সমতা বজায় রাখার জন্য বৃক্ক একটি বিশেষ ভূমিকা নেয়। সেগুলি হচ্ছে–

১. বৃক্ক নালিকার মধ্যে যে কোষগুলি আছে তার অধিকাংশই হাইড্রোজেন আয়ন মুক্ত করে এবং তাতে ক্ষারকীয় আয়ন বিশোষণ হয়। বৃক্ক নালিকায় যে হাইড্রোজেন আয়ন প্রবেশ করে তা সোডিয়াম আয়ন মুক্ত করে। হাইড্রোজেন আয়ন আবার বাই-কার্বনেট আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রথমে কার্বনিক অ্যাসিডের সৃষ্টি করে এবং তার থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড সৃষ্টি হয়। এই কার্বন ডাই-অক্সাইড নালিকা কোষে প্রবেশ করে।

২. শরীরে যদি অম্লের মাত্রা বেড়ে যায় তবে তা মূত্র হয়ে অম্ল ফসফেটরূপে

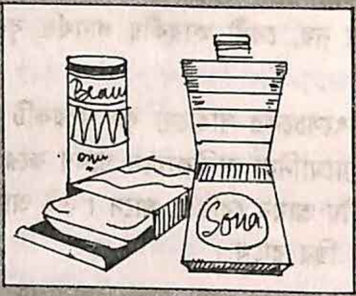
বেরিয়ে আসে। এবং ক্ষারের পরিমাণ বাড়লে মূত্র থেকে ক্ষারকীয় ফসফেট বেরিয়ে আসে।

৩. বৃক্ক সরাসরি কোন কোন অম্লকে দেহ থেকে বের করে দিতে পারে। এর ফলে শরীরের অম্ল ও ক্ষারের মধ্যে সমতা বজায় থাকে। যে সব অম্ল বৃক্ক বের করে দিতে পারে তার মধ্যে অ্যাসিটো অ্যাসেটিক অ্যাসিড, ইউরিক অ্যাসিড বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শুধুমাত্র অম্ল নয়, বেশী ক্ষারকীয় পদার্থও বৃক্ক বের করে সাম্যাবস্থা বজায় রাখে।

৪. ডি-অ্যামাইনেজ উৎসেচকের সাহায্যে বৃক্ক কয়েকটি অম্ল থেকে অ্যামোনিয়া মুক্ত করে। এই উৎপন্ন অ্যামোনিয়া নালিকারসে প্রবেশ করে এবং যখন অম্লমূলকের সঙ্গে যুক্ত হয় তখন ক্ষারকীয় আয়ন বেরিয়ে আসে। এই আয়নগুলি পুনরায় শোষিত হয়ে দেহে ক্ষারের পরিমাণ স্থির রাখে।

সুতরাং শরীরের ক্ষার ও অম্লের মধ্যে একটা বোঝাপড়া থাকে এবং তার উপর রক্তের pH এর মান নির্ভর করে। প্রকৃতিও বিভিন্নভাবে শরীরের এই ক্ষার ও অম্লের সাম্যকে বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই অবস্থায় রক্তের pH একটা নির্দিষ্ট সীমারেখার মধ্যে থাকে এবং তার বাইরে গেলেই মানুষের মৃত্যুর সম্ভাবনা ঘটে।

আমাদের প্রসাধন



স্নো, পাউডার, সাবান, নখ-পালিশ, লিপস্টিক, সেন্ট, লুজ্, গন্ধ তেল প্রভৃতির ব্যবহার আজকাল ঘরে ঘরে ছড়িয়ে পড়েছে। প্রাচীনকালে ললনাদের প্রিয় অঙ্গরাগের মধ্যে পড়ে অগুরু, চন্দন, লোধ, রসাঞ্জন, কুঙ্কুম প্রভৃতি। বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে এইসব জিনিস তৈরী করা হয়। ছেলেদের চেয়ে মেয়েদের কাছে প্রসাধন সামগ্রীর আদর বেশি।

কয়েক হাজার বছর আগে প্রসাধন সামগ্রীর কথা ধর্মীয় উপাদানের ক্ষেত্রে মিশে ছিল। প্রায় পাঁচ হাজার বছর আগে ভারত, চীন ও ইজিপ্টের লোকেরা ধর্মীয় আচার বিধিতে ধূপধূনার ব্যবহার করত। এবং তারা বিভিন্ন তেল, মশলা এবং মলম দেহে মালিশ করত। মৃতদের শরীরকে অনেকদিন সতেজ রাখার জন্য বিভিন্ন মলম, তেল, মালিশ করার প্রথা ছিল। কলকাতার যাদুঘরে প্রায় চার হাজার বছরের পুরনো এক শবকে রাসায়নিক ঔষধ দিয়ে রাখা হয়েছে।

ইহুদিরা যখন ইজিপ্টে ছিল তখন তারা বিভিন্ন সুগন্ধি দ্রব্যের ব্যবহার ওখান থেকে শিখে নিয়েছিল। বাইবেলের একভাগে (ওল্ড টেস্টামেন্ট) বলা আছে যে ইহুদিরা এই ব্যাপারে বহুল চর্চা করে বেশ উন্নত হয়েছিল যার ফলে পৃথিবীর অন্য দেশও তাদের কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েছিল।

স্নান করা একটা প্রাত্যহিক নিয়ম বলে আমরা জানি এবং এর দ্বারা আমরা নিজেদের পরিষ্কার রাখি। স্নানের এই রীতি প্রথম চালু করেছিল প্রাচীন যুগের



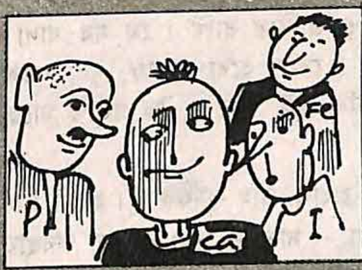
ইজিপ্টের লোকেরা। এরপর তারা চুলের যত্ন নিতে শিখে ফেলল এবং ক্রমে ক্রমে চুলে রং মাখা, চুলে বিভিন্ন বাহার খেলানোর চেষ্টা করল। চুলকে রং করতে, আঙ্গুলের নখকে রং করতে, হাতের পাতা, পায়ের পাতা লাল করতে যে জিনিসটা তারা ব্যবহার করত তার নাম ছিল 'হেন্‌ন'। চোখের ভ্রু রং করাও একটা ফ্যাশন ছিল। ম্যালাকাইট নামে এক ধরনের জিনিসের সাহায্যে চোখের পাতার ভেতরের দিকটা সবুজ রং করত। কোল (Kohl) এর সাহায্যে কালো রং করত চোখের কোণে। কোলের এই কালো রঙে থাকত গ্যালেনা বা স্টিবনাইট। বাইবেলে আছে যে জেসেবেল তাঁর চোখকে স্টিবিকে পাথর দিয়ে রং করতেন। অন্ততঃপক্ষে খ্রীষ্টপূর্ব দু হাজার বছর আগে গ্রীকরা স্নানের পর একধরনের গন্ধবিহীন তেল ব্যবহার করত। শরীরে মালিশ করার জন্যও ঐ তেল তারা ব্যবহার করত। বিভিন্ন ফুলকে প্রথমে শুকিয়ে এবং পরে ভাল গুঁড়ো করে নিয়ে এক ধরণের পাউডার তৈরী করত। এই পাউডার শরীরে মাখলে গায়ের ঘাম শুকিয়ে যেত।

চামড়া সম্বন্ধে সচেতনতা এবং চর্ম্মবিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্ভবতঃ গ্রীকরাই প্রথম করেছিল। এরপর রোমানরা গ্রীকদের কাছ থেকে এই শিক্ষা লাভ করে এবং তারা স্নানের সময় বিভিন্ন সুগন্ধি ব্যবহার করা শুরু করে। তেলেতেও বিভিন্ন সুগন্ধি মেশান শুরু করল।

শোনা যায় সম্রাট নীরো তার খাবার হলঘরের ছাদ থেকে এক ধরণের সুগন্ধি ছড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁর নিমন্ত্রিত অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য। নীরোর স্ত্রী তাঁর চামড়া সাদা করার জন্য হোয়াইট লেড এবং খড়ি ব্যবহার করতেন। চোখের পাতায় ব্যবহার করতেন কোল। গালে এবং ঠোঁটে মাখতেন লাল রং। ময়দা ও মাখন ব্যবহার করতেন ব্রণ বা ফুসকুড়ি মারার জন্য এবং পিউমিস পাথর ব্যবহার করতেন দাঁতকে সাদা করার জন্য।

১৮ শতকে ইংলন্ডের কৃষক পরিবারের মেয়েরা বীটের রসকে লিপস্টিক হিসাবে এবং ময়দাকে ব্যবহার করত মুখ ও শরীরের পাউডার হিসেবে। এইভাবে প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহার দিনে দিনে এতই প্রকট হয়ে উঠল যে সেখানকার পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য ১৭৭০ সালে এর বিরুদ্ধে একটা বিল আনলেন। এতে বলা হল— 'কোন মহিলা যদি কৃত্রিম চুল, দাঁত ব্যবহার করেন এবং রং মেখে কোন পুরুষকে বিবাহে প্রলুব্ধ করেন তবে তাঁকে শাস্তি পেতে হবে'। এই আইন পরে পেনসিলভেনিয়াতে চালু করা হয়। বর্তমানে ফ্রান্সের পরে ইংলন্ড ও আমেরিকা প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহারে পৃথিবীর অন্যান্য দেশকে ছাড়িয়ে যাচ্ছে। ভারতও প্রসাধন সামগ্রীর ব্যবহারে খুব পিছিয়ে নেই।

চার মৌলের আত্মকথা



আমরা চারটি মৌল। তোমাদের অতি পরিচিত। রূপে, গুণে আমরা যেমনই হই না কেন, আমাদের প্রত্যেকেরই প্রয়োজন আছে তোমাদের জীবনে। চারজনের মধ্যে আমরা দু'জন ধাতু এবং বাকী দু'জন অধাতু। আমাদের গুণাবলী তোমাদের কাছে তুলে ধরছি। সে সব কথা শুনে বিচার করো আমাদের মধ্যে কার প্রয়োজনীয়তা তোমাদের কাছে বেশি ? তোমাদের বিচারের মূল্য আমরা অবশ্যই দেবো।

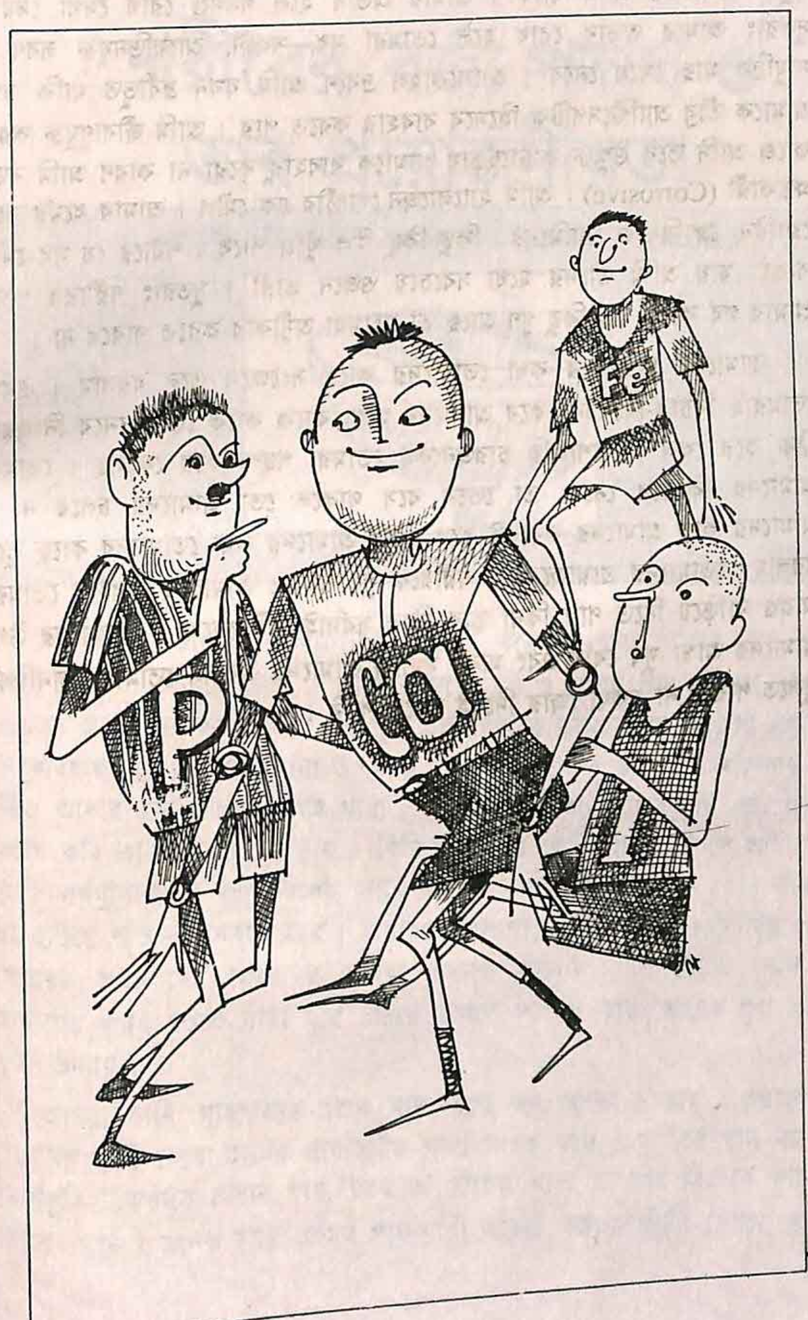
এক–আমি একটি ধাতু, নাম লোহা বা আয়রন। অনেক যৌগেই আমি থাকি। যেমন, অক্সাইডরূপে, ক্লোরাইডরূপে। আমি মানুষের রক্তের উপাদানও বটে। পেটা লোহা, ঢালাই লোহা, ইস্পাত প্রভৃতি হিসেবে তোমরা আমাকে চেনো এবং বিভিন্ন কাজে আমার ব্যবহার সকলেরই জানা। তবে বিশুদ্ধ অবস্থায় রসায়নাগারে ও শিল্পে অনুঘটকরূপেই আমার চলন বেশি। মানুষের রক্তের উপাদান বলে, আমার অভাব ঘটলে রক্তের জোর কমবে এবং তাতে শরীর অসুস্থ হয়ে যাবে। কোন্ কোন্ খাবারে আমি থাকি তাও জানিয়ে রাখি। যেমন– মেটে, ডিম, মটর, কড়াইশুঁটি, শাকসব্জি ও আটাতে।

দুই– আমিও একটি ধাতু, নাম ক্যালসিয়াম। বিভিন্ন যৌগে আমার বাস। আমার মূল আকর হচ্ছে ক্যালসাইট, ক্যালসাইট থেকে আমাকে নিষ্কাশিত করা হয়েছিল, তাই আমার নাম ক্যালসিয়াম। ১৮০৮ খ্রিস্টাব্দে বার্জেলিয়াস, পনটিন এবং

ডেভি আমাকে আবিষ্কার করেন। চুন, চুনাপাথর, চক প্রভৃতিতে আমি থাকি। সুপার ফসফেট অফ লাইম যা সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়, আসলে তাও হচ্ছে আমারই এক যৌগ। যেসবের মধ্যে আমি থাকি সেগুলি হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড, ফসফেট, কার্বনেট, নাইট্রেট প্রভৃতি যৌগ। আমি শরীরে প্রবেশ করে হাড়কে মজবুত করি, দাঁত ভাল রাখার চেষ্টা করি, রিকেট রোগকে দূরে সরিয়ে রাখি, আর এছাড়া স্নায়ুতন্ত্রের স্বাস্থ্যের দিকেও আমার নজর সদাজাগ্রত। কোন্ কোন্ খাবারে তোমরা আমায় পেতে পারো তাও জানিয়ে রাখি। যে সব খাদ্য তোমরা সচরাচর খেয়ে থাক তার মধ্যেই থাকি। যেসন ধরো– কফি, দুধ, বরবটি, মটর, ডিমের কুসুম প্রভৃতিতে। এছাড়া ভেটকি, রুই, কাতলা, কৈ প্রভৃতি মাছেও আমাকে পাবে যথেষ্ট পরিমাণে।

তিন– আমি একটি অধাতু, নাম ফসফরাস। আমি এক বহুরূপী মৌল। আমার প্রধান দুটি রূপভেদ হলো – সাদা ও লাল। সাদা অবস্থায় আমি থাকতে চাই না, সুযোগ খুঁজি লাল বর্ণের রূপ নেবার। ২৪০° সেলসিয়াস উষ্ণতায় আমি নাইট্রোজেনের পরিবেশে লাল বর্ণের রূপ নিই। প্রাণিজগতে আমি ফসফেট হিসেবে থাকি অর্থাৎ চারটি অক্সিজেন পরমাণু আমার সঙ্গ নেয়। দেহে আমার পরিমাণ প্রায় ৬০০ গ্রাম এবং তার শতকরা ৪০ ভাগ ক্যালসিয়ামের সঙ্গেই মিশে থাকি এবং শরীরের হাড় গঠনেই আমার ভূমিকা বেশি। বাকী অংশটা কোষের নিউক্লিক অ্যাসিড, শক্তি সঞ্চয় যৌগ এবং কো-এনজাইম গঠনে প্রয়োজন হয়। সেফটি ম্যাচ বা নিরাপদ দেশলাইয়ে লাল বর্ণে আর লুসিফার দেশলাইয়ে সাদা বর্ণে আমি থাকি। সাদা অবস্থায় তোমরা আমায় মুখে নিও না, কারণ তখন আমি বিষে বিষময়। ইদুঁর মারার জন্য তোমরা তখন আমায় ব্যবহার করতে পারো। আমি জীবজন্তুর হাড়ে এবং বহু খনিজ ফসফেটে থাকি একথা আগেই বলেছি কিন্তু ফ্যাট, চিনি (বা শর্করা) এবং অ্যালকোহলে আমাকে তোমরা পাবে না। আমি শরীরের হাড়কে মজবুত করি। শরীরের টিসু গড়ি, দাঁতকে ভালো রাখি। এছাড়া রিকেট রোগের প্রতিষেধকরূপেও কাজ করি। মেটে, মাছ, ডিমের কুসুম, বরবটি, মটর, গাজর, কড়াইশুঁটি, দুধ প্রভৃতি খাদ্যে তোমরা আমায় পাবে। কোন কোন অ্যান্টাসিড খুব বেশি মাত্রায় খেলে শরীরে আমার অভাব ঘটে, সুতরাং সেদিকে তোমরা নজর রাখবে। নতুবা মৃত্যুই হবে শেষ পরিণতি, যা আমি কখনই ঘটাতে চাই না।

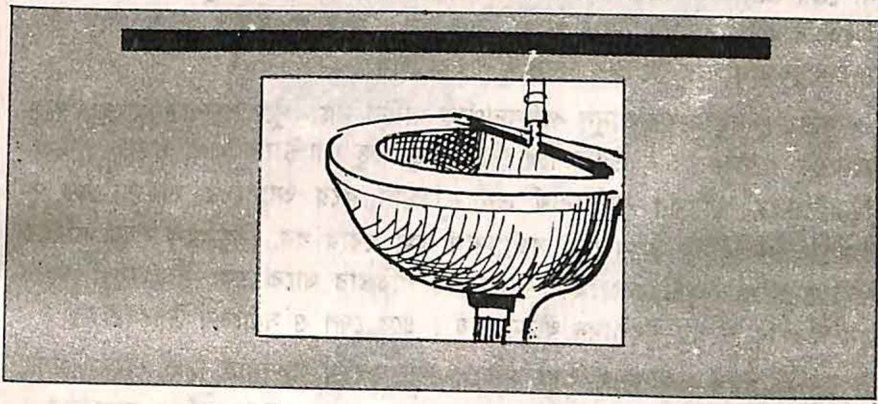
চার– আমিও একটি অধাতু, নাম আয়োডিন। ১৮১২ খ্রিস্টাব্দে কুর্তো সাহেব কালো বর্ণের আমাকে প্রথম সৃষ্টি করেছিলেন কি এক বিক্রিয়ায়। এরপর গে-ল্যুসাক নামে এক বিজ্ঞানী আমার এই নাম রাখেন। শরীরে আমি পরাণুমৌল (trace element) হিসেবে থাইরোডিন হরমোনের মধ্যে থাকি। এই হরমোনটি কোষের সাহায্যে থাইরয়েড গ্রন্থিতে সৃষ্টি হয়। সমুদ্রের জলজ উদ্ভিদে, সমুদ্রের জলে, খনিজ


Fe
P
Ca
I

জলে আয়োডাইডরূপে আমি থাকি । দুধ, কডলিভার তেল, ঝিনুক এবং কিছু কিছু সবুজ সবজীতেও আমি থাকি । আমার অভাব হলে গলগণ্ড রোগ দেখা দেয় । সুতরাং আমার অভাব বোধ হলে তোমরা দুধ, সবজী, আয়োডিনযুক্ত লবণ ও সামুদ্রিক মাছ খেয়ে নেবে । অ্যালকোহল দ্রবণে আমি যখন দ্রবীভূত থাকি তখন আমাকে তীব্র অ্যান্টিসেপটিক হিসেবে ব্যবহার করতে পার । আমি জীবাণুমুক্ত করণে কাজে আসি তবে উন্মুক্ত কাটাছেঁড়ায় আমাকে ব্যবহার করো না কারণ আমি বড়ই ক্ষয়কারী (Corrosive)। আমি হ্যালোজেন গোষ্ঠীর এক মৌল । আমার ধর্মের সঙ্গে ফ্লোরিন, ক্লোরিন ও ব্রোমিনের কিছু কিছু মিল খুঁজে পাবে । শরীরে যে সব মৌল পাওয়া যায় আমি তাদের মধ্যে সবচেয়ে ওজনে ভারী । সুতরাং শরীরের গঠনে আমার গর্ব করার মত কিছু গুণ আছে তা তোমরা অস্বীকার করতে পারবে না ।

আমাদের চারজনের কথা তোমাদের কাছে সংক্ষেপে তুলে ধরলাম । এবার তোমরাই বিচার-বিবেচনা করে আমাদের মধ্যে কাকে কাকে ডেকে নেবে নিজেরাই ঠিক করে ফেল । আশাকরি চারজনকেই তোমরা পছন্দ করে ফেলেছ । তোমরা আমাদের কিভাবে নেবে, তা ভেবে বসে থাকলে তো আমাদের চলবে না । আমাদের কাজ আমাদের করতেই হবে । শুধু আমাদের কথা তোমাদের কাছে তুলে ধরলাম তোমাদের প্রয়োজনেই । শরীরকে সুস্থ রাখতে আমাদের ব্যবহার তোমরা আরও বাড়িয়ে নিতে পার কিনা তার দিকে সর্বদাই দৃষ্টি রেখো । তোমাদের উপর আমাদের আস্থা খুব বেশি এবং মানব সমাজে আমাদের অবদান তোমরা কোনদিনই ভুলতে পারবে না একথা জোর দিয়েই বলতে পারি ।

শরীরের বর্জ্য পদার্থ ও তার প্রয়োজনীয়তা



আমাদের শরীর থেকে স্বাভাবিক নিয়মেই কয়েকটি পদার্থ (যেমন মল, মূত্র, ঘাম প্রভৃতি) বেরিয়ে আসে । সেগুলির মধ্যে মল ও মূত্রের প্রয়োজনীয়তা নিয়েই এখানে আলোচনা করা হচ্ছে । এই দুটি বর্জ্যপদার্থকে আমরা ঘৃণা করলেও এগুলির সদ্ব্যবহার কিন্তু আমাদের নানা উপকারে আসে । আমাদের কাছে যা বর্জ্যপদার্থ তা কিন্তু আবার অন্য জীবের ক্ষেত্রে খাদ্য । আমরা অপরিকল্পিতভাবে যদি বর্জ্য পদার্থ ত্যাগ করি তা নানা রোগ ছড়ায় । বিভিন্ন রোগের থেকে বাঁচতে গেলে আমাদের বর্জ্যপদার্থগুলিকে শুধু ঘৃণা করলেই চলবে না, কি করলে সেগুলি থেকে কোন জীবাণু না ছড়িয়ে পড়ে তা দেখতে হবে । সাধারণত বর্জ্যপদার্থগুলি পরিস্কারের দায়িত্ব হচ্ছে মেথরের অথচ সেই মেথরদের আমরা কখনও কখনও ঘৃণার চোখে দেখি । আমাদের ঘৃণার বস্তুকে যারা দূরে সরিয়ে রাখতে সাহায্য করে, তাদের ঘৃণা করা খুবই অন্যায় ।

আমরা জানি, গাছপালার প্রধান খাদ্য হচ্ছে জল, আলো ও বায়ু । এছাড়াও গাছপালা মাটি থেকে তাদের প্রয়োজনীয় খাদ্য সংগ্রহ করে । মাটিতে যদি বর্জ্য-পদার্থগুলি ঠিকভাবে মেশান যায়, তবে তা গাছের খাদ্য বা সার হিসেবে কাজে লাগতে পারে । অনেক সময় গ্রামের পথে-ঘাটে আমরা বর্জ্যপদার্থগুলি দেখতে পাই

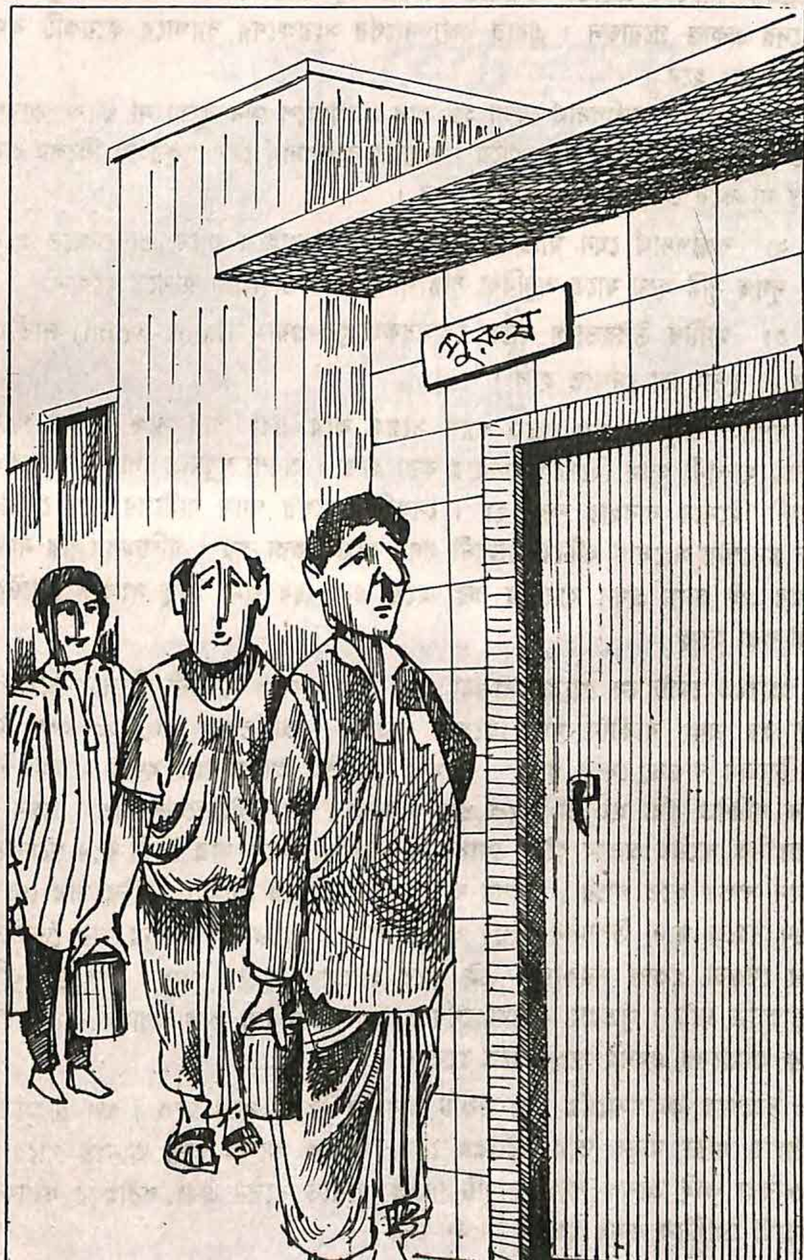
এবং সেগুলি থেকে নানা রোগ ছড়ায়, অথচ সেগুলি যদি একটা নির্দিষ্ট স্থানে জমা করে তার ওপর মাটি চাপা দেওয়া যেত তবে তা একদিন সারে পরিণত হয়ে কত কাজে লাগান যেত। আমরা মানুষরা এই ব্যাপারে সামান্য বিড়ালের কাছ থেকেও শিক্ষা নিতে পারি। বিড়াল যখন মলত্যাগ করে তখন সে তার মল মাটি চাপা দিয়ে যায় এরং তা থেকে কোনরকম রোগ ছড়াতে পারেনা এবং কিছুদিন পর তা সারে পরিণত হয়। মানুষের বর্জ্যপদার্থ থেকে কম্পোস্ট সার তৈরী করা যায়। তবে এর জন্য জৈব আবর্জনা মেশাতে হয়। আবর্জনা ও বর্জ্যপদার্থের স্তূপ বানিয়ে তাতে গোবরজল ও কাদামাটি দিয়ে প্রলেপ দিতে হয়। জৈব পদার্থগুলি ক্রমশ পচে যায় এবং কয়েকমাস পরে তা সার হিসেবে পাওয়া যায়।

পৃথিবীর বহুদেশের মানুষ বর্জ্যপদার্থকে মাটির নীচে পুঁতে ফেলার অভ্যেস গড়ে ফেলেছেন। কোন কোন উন্নয়নশীল দেশে কিছু কিছু পোস্টারে লেখা থাকে, পথিক, তুমি তোমার শরীরের বর্জ্যপদার্থ এখানে ত্যাগ করে আমাদের সাহায্য কর।' এইকাজে এক নির্দিষ্ট স্থানে সেই বর্জ্যপদার্থ জমা হবার পর, সেগুলিকে সারে পরিণত করা হয়। এতে দুটি কাজ হয়, রাস্তা-ঘাট পরিস্কার থাকে এবং প্রায় বিনা খরচে প্রচুর পরিমাণ সারের উৎপাদন ঘটান যায়। এতে দেশ ও সমাজের উপকার হয়।

নির্দিষ্ট স্থানে বর্জ্যপদার্থ ত্যাগ করলে এবং জলের সরবরাহ ঠিক থাকলে মশা, মাছি বা অন্যান্য কীটপতঙ্গের উপদ্রব দেখা দেয় না বা কোন দুর্গন্ধও আসে না। বর্জ্যপদার্থ থেকে যে সার হয়, তা বহু গাছ সহজেই গ্রহণ করে এবং সেইসব গাছ থেকে মানুষ নানা ফসল পেয়ে থাকে। সুতরাং বর্জ্যপদার্থগুলি মানুষের ক্ষতির কারণ না হয়ে প্রয়োজনীয় পদার্থ হিসেবে কাজে আসে।

মানুষের মল বহুদিন ধরেই নানা দেশে সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। এগুলি জৈব সার। বর্জ্যপদার্থের সংরক্ষণ এবং সেগুলির যথাযথ ব্যবহারের ফলে সার হিসেবে উদ্ভিদের খাদ্য উপাদানের যোগান হয় এবং সেইসঙ্গে জ্বালানীর কাজেও লাগে। ভারতে এর ব্যবহার এখনও তেমন হচ্ছে না, অথচ চীন ও জাপানে এগুলির ব্যবহারে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়। মানুষের মলে জলীয় ভাগটাই বেশি থাকে। এছাড়া থাকে জৈবপদার্থ যার পরিমাণ শতকরা ২২ ভাগ। খনিজ পদার্থ প্রায় ৩ ভাগ, নাইট্রোজেন ১.৫ ভাগ, পটাস ৫.৫ ভাগ থাকে (শতকরা হিসেবে) এবং কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাত ৭.৩। কিন্তু মূত্রে জৈব পদার্থের পরিমাণ মাত্র ২ ভাগ। এছাড়া খনিজ পদার্থ, নাইট্রোজেন ও পটাস থাকে যথাক্রমে ১.৬ এবং .২ ভাগ এবং কার্বন ও নাইট্রোজেনের অনুপাতটি থাকে ১:৩।

গরু, মোষ, শুয়োর, ঘোড়া, ভেড়া, মুরগী, পশুপাখির বর্জ্যপদার্থগুলিও সার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। বিভিন্ন পশুর বর্জ্যপদার্থের গঠন ও প্রকৃতি রিভিন্ন-


পুরুষ

সুতরাং বিভিন্ন ধরনের সার পাওয়া যায়। বিভিন্ন মাটিতে বিভিন্ন ধরনের সারের প্রয়োজন হয়। গরুর গোবরে বেশির ভাগটাই জল থাকে এবং বাকীটা থাকে জৈব ও অজৈব পদার্থ। এছাড়া গোবরে বিভিন্ন অণু খাদ্য থাকে। এইসব অণু খাদ্য উদ্ভিদের একান্ত প্রয়োজন। এবার বর্জ্যপদার্থের সংরক্ষণের ব্যাপারে কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে।

১) যে গর্তে বর্জ্যপদার্থ ফেলা হয় তার আশেপাশে যেন কুয়ো না থাকে, কারণ তাতে কুয়োর জল দূষিত হতে পারে। এছাড়া বর্জ্যপদার্থ যেন পুকুর বা ঝিলের জল দূষিত না করে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

২) বর্জ্যপদার্থ যেন মাছি ও পশুর আওতার বাইরে থাকে তা দেখতে হবে এবং দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে যাতে অসুবিধা সৃষ্টি না করে তাও নজরে রাখতে হবে।

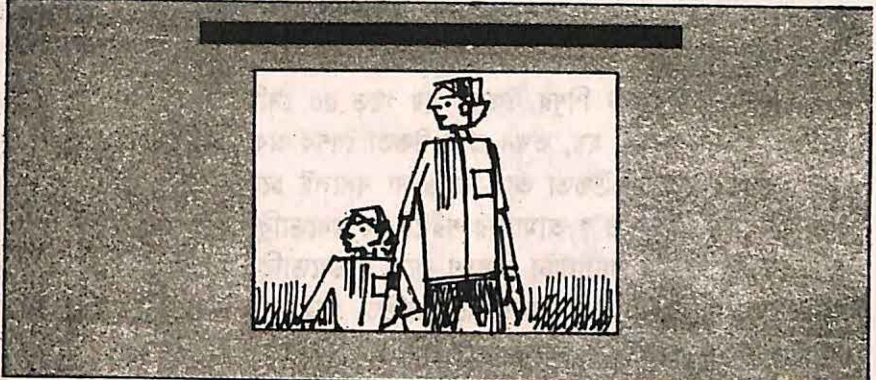
৩) মাটির উপরভাগে যাতে কোনরকম হুক-ওয়ার্ম (hook-worm) জাতীয় রোগ না ছড়ায় তা দেখতে হবে।

সম্প্রতি মানুষের মল থেকে গ্যাস সংগ্রহ করে এবং তার সঙ্গে গোবর গ্যাস মিলিয়ে জ্বালানী গ্যাস হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। অবশ্য শুধুমাত্র গোবর গ্যাসকেও জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয়। সেফটি ট্যাঙ্কের গ্যাস পাইপের সঙ্গে গোবর গ্যাস প্ল্যান্টের সংযোগ ঘটিয়ে জ্বালানী গ্যাস সংগ্রহ করা হয়। পশ্চিমবাংলার নানা জেলায় এই গ্যাস এখন ব্যবহার করা হচ্ছে এবং এর জন্য কিছু সংখ্যক প্ল্যান্টও তৈরী করা হচ্ছে।

ভারতে মোট যে গোবর পাওয়া যায় তার অর্ধেক জ্বালানী হিসেবে ব্যবহার করা হয় এবং বাকীটা সার হিসেবে ব্যবহার করা গেলে প্রায় ২০ লক্ষ টন নাইট্রোজেন পাওয়া যেতে পারে। নর্দমায় নিষ্কাশিত আবর্জনাকে বছরে ২ লক্ষ টন পাঁকে পরিণত করা হয় তা থেকে প্রায় ২ হাজার টন নাইট্রোজেন পাওয়া সম্ভব। রাসায়নিক সারের অভাব ঘটলে গোবর ও আবর্জনা থেকে সার তৈরী করে প্রয়োজন মেটান সম্ভব হতে পারে। গোবর বা আবর্জনা সারের চেয়ে পোলট্রির সার থেকে উদ্ভিদ সহজে খাদ্য উপাদান সংগ্রহ করতে পারে। সুতরাং পোলট্রির সার তৈরীতে নজর দেওয়া একান্ত দরকার। এই সারে হরমোন থাকায় গাছের শিকড়ের বৃদ্ধি তাড়াতাড়ি ঘটে। সুতরাং বর্জ্যপদার্থের অপচয় না ঘটিয়ে তার যথাযথ ব্যবহারের দিকে আমাদের এখনই সচেষ্ট হতে হবে।

সবশেষে বর্জ্যপদার্থের আর একটি ব্যবহার উল্লেখ করা যাক। মল ও মূত্রের পরীক্ষার দ্বারা মানুষ তার শরীরের রোগ সম্পর্কে অনেক তথ্য জানতে পারে। ডাক্তাররা তাই অনেক সময় এ দুটি পরীক্ষা করতে বলেন এবং পরীক্ষার ফলাফল অনুযায়ী রোগীকে ওষুধ গ্রহণের নির্দেশ দেন।

লম্বা, বেঁটে রহস্য



চাঁদে মহাকাশচারীরা বেশ কয়েকবার গেছেন। সেখানে তাঁরা যেসব অভিজ্ঞতা পেয়েছেন, সেগুলির মধ্যে একটি হলো খুবই মজার। তাঁরা নাকি সেখানে গিয়ে কিছুটা লম্বা হয়েছিলেন। এই লম্বা হওয়ার ব্যাপারটা কলকাতায় জানিয়ে গেছেন মহাকাশচারী জেমসবি আরউইন। তিনি বলেছেন যে, চাঁদে গিয়ে তিনি প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা হয়েছিলেন। সেখানে তাঁর রক্তের লোহিত কণার সংখ্যা প্রচুর কমে গিয়েছিল। ওজন কমেছিল প্রায় সাত ভাগ। পৃথিবীতে যাঁর ওজন ছিল ১৬০ পাউণ্ড, তাঁরই কিনা চাঁদে গিয়ে ওজন হয়েছিল মাত্র ২৬ পাউণ্ড। পৃথিবীতে ফিরে আসতেই তিনি আবার তাঁর আগের উচ্চতা ও ওজন ফিরে পান। সুতরাং আরউইন সাহেবের কথা থেকে বলা যায় যে সাময়িকভাবে লম্বা হওয়া যায় চাঁদে গেলে।

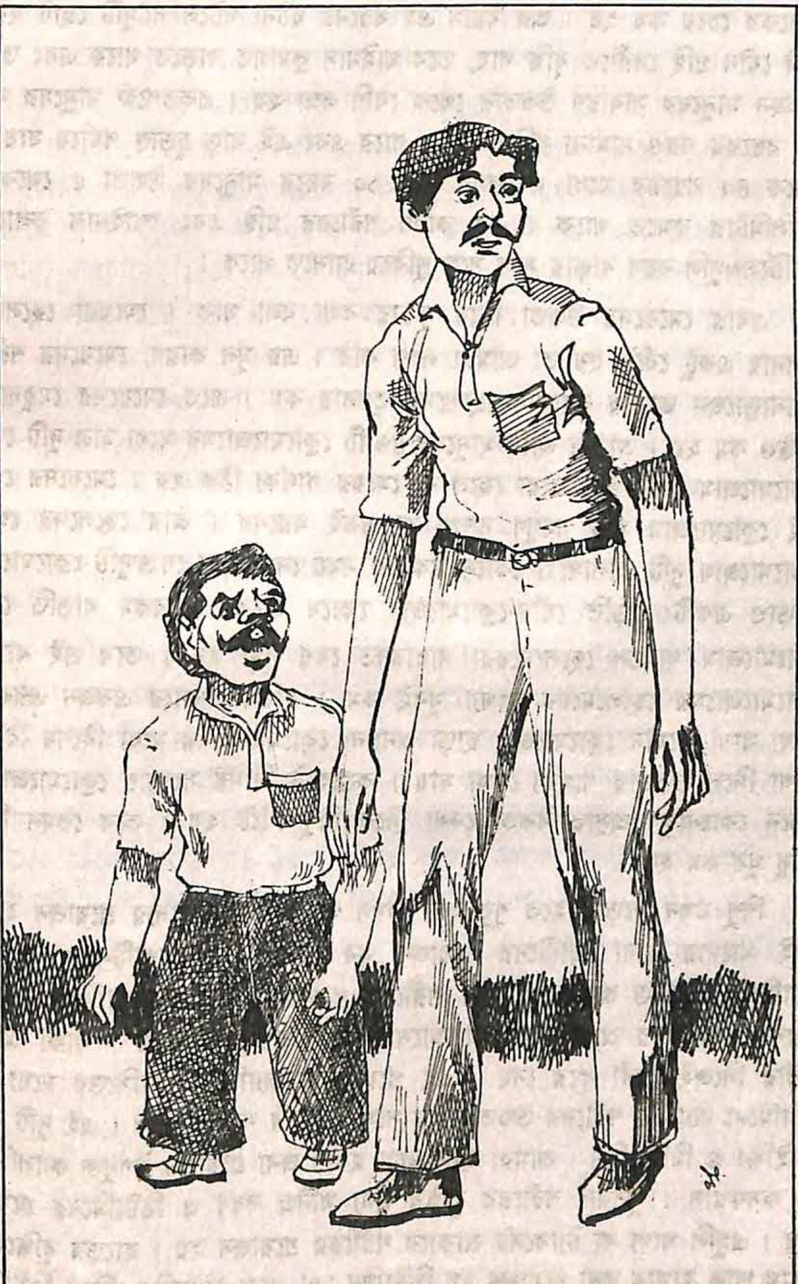
লম্বা হওয়ার বাসনা অনেক বেঁটে লোকের মধ্যে বেশ প্রবলভাবে দেখা যায়। অথচ তাঁরাও জানেন বেশি লম্বা লোককে নানা বিপদে পড়তে হয়। লম্বা লোকদের নীচু ছাদের মিনিবাস বা দোতলা-বাসের দোতলায় মাথা নিচু করে চলাফেরা করতে হয়। অর্থাৎ ঘাড় নিচু করে তাঁদের তখন থাকতে হয়। এতে স্পনডিলাইটিস হবার সম্ভাবনা বাড়ে। এছাড়া লম্বা লোকদের জামা-প্যান্টের কাপড় বেঁটে লোকদের চেয়ে বেশি লাগে। এখন এই লম্বা বা বেঁটে হওয়ার মূলে রহস্য কী আছে তা জানা যাক। এর মূলগত তফাতটা মানুষের গঠনের মধ্যে লুকিয়ে আছে।

বেশি লম্বা হওয়ার কারণ হিসেবে বলা যায় যে এর পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে

বেরিয়ে আসা গ্রোথ হরমোনের প্রভাব আছে। আমাদের শরীরের প্রতি লিটার রক্তে এই গ্রোথ হরমোনের পরিমাণ ২ থেকে ৩ মাইক্রোগ্রাম। হরমোনটির এই পরিমাণ যদি বেড়ে যায় তখনই মানুষ লম্বা হয়ে যেতে পারে। এই হরমোনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোনগুলিও কাজ করে যায়। থাইরয়েড গ্রন্থির হরমোন থাইরক্সিন এবং গ্রোথ হরমোন পরস্পর একে অন্যের পরিপূরক। থাইরক্সিন হরমোনের অভাব হলে গ্রোথ হরমোনও ঠিকভাবে কাজ করতে পারে না। এতে একটি শিশু স্বাভাবিক যতটা লম্বা হওয়ার ততটা হয় না।

জন্মের পর একটি শিশুর উচ্চতা হয় গড়ে ৫০ সেমি। এই শিশুটি যখন ২০ বছরের যুবকে পরিণত হয়, তখন তার উচ্চতা শৈশব অবস্থার উচ্চতার প্রায় তিনগুণ হয়। এরপর যুবকের উচ্চতা আর বাড়ে না বললেই চলে। কি কারণে এই বেড়ে যাওয়াটা বন্ধ হয়ে যায়? আমাদের শরীরে যে এনডোক্রিন গ্রন্থিগুলো আছে, সেগুলি শরীরের এই বাড়ার ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রণ করে। এনডোক্রিন গ্রন্থিগুলো হলো—গলার থাইরয়েড, পিটুইটারী–যা ব্রেনের সঙ্গে জড়িত, থাইমাস–যা বুকে (Chest) থাকে এবং এছাড়া যৌন গ্রন্থি। পিটুইটারী গ্রন্থি হচ্ছে সেই গ্রন্থি যা হাড়ের বৃদ্ধিকে পুষ্ট করে। যদি এই গ্রন্থি বেশি সক্রিয় হয়, তবে আমাদের হাড়ের বাহু এবং পা বেশী বাড়ে অর্থাৎ হাত-পা খুব বড়ো হয়। যদি গ্রন্থিটি উপযুক্ত ভাবে কাজ না করে তবে আমরা বামন আকৃতি লাভ করব।

একটি শিশু সাধারণভাবে বড়ো মাপের থাইমাস গ্রন্থিসমেত জন্মগ্রহণ করে এবং তা সমস্ত শৈশবকাল ধরেই বাড়তে থাকে। যখন শিশুর বয়স ১৩ বা ১৪ হয়, তখন থাইমাস গ্রন্থি ছোট হতে শুরু করে। থাইমাস গ্রন্থি ও যৌন গ্রন্থির মধ্যে একটি সম্পর্ক থাকতে পারে। যতদিন থাইমাস গ্রন্থি কাজ করে, ততদিন যৌন গ্রন্থি ছোট থাকে। যখন যৌন গ্রন্থি বৃদ্ধি পায় তখন থাইমাস গ্রন্থির কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এই কারণে যখন ২২ বছরে একজন মানুষ যৌন পরিণতি লাভ করে তখন তার বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায়। আমাদের শরীরের হাড় একটা নির্দিষ্ট বয়স পর্যন্ত বাড়তে পারে। এই হাড় হচ্ছে একটি হাইড্রক্সি অ্যাপাটাইট ধরনের লবণ। হাড় বৃদ্ধিতে মূলত ক্যালসিয়াম ও ফসফেট লবণের আস্তর জমে। হাড়ের দু' প্রান্তের মাথার কাছাকাছি যে কার্টিলেজ থাকে, তার এক অংশ দু'পাশে বাড়তে থাকে। কার্টিলেজের এই বিশেষ অংশের নাম এপিফাইসিয়াল প্লেট। এর ওপর বিভিন্ন লবণ জমা হয় এবং তাতে হাড় বেড়ে যায়। এই এপিফাইসিয়াল প্লেট সবশেষে হাড়ের মূল অংশের সাথে জুড়ে যায়। এই ঘটনাটি ঘটতে যে হরমোনটি কাজে আসে তার নাম অ্যানড্রোজেন। এপিফাইসিয়াল প্লেট বন্ধ হয়ে গেলে হাড়ের বৃদ্ধিও থেমে যায়। এই বৃদ্ধি সাধারণত কুড়ি থেকে বাইশ বছর অবধি চলে। অ্যানড্রোজেন হরমোনটির পরিমাণ কম হলে হাড় বৃদ্ধি ঠিকভাবে হয় না এবং দেহের সুঠাম গঠন হয় না।



কখনও কখনও যৌন গ্রন্থি খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে যায় এবং থাইমাস গ্রন্থিকে ধীরগতি করে দেয় খুব কম বয়সে। এতে একজন লোকের গড় উচ্চতা স্বাভাবিক লোকের চেয়ে কম হয়। অল্প বয়সে এই ধরনের ঘটনা ঘটলে পা'দুটি ছোট হয়। যদি যৌন গ্রন্থি দেরীতে বৃদ্ধি পায়, তবে থাইমাস ক্রমাগত বাড়তে থাকে এবং তাতে একজন মানুষের সাধারণ উচ্চতার থেকে বেশি লম্বা হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষের বাড় ২৫ বছরের পরও সামান্য পরিমাণ হতে পারে এবং এই বাড় চূড়ান্ত পর্যায়ে যায় ৩৫ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে। এরপর প্রতি ১০ বছরে মানুষের উচ্চতা ৫ থেকে ৬ মিলিমিটার কমতে থাকে। এর কারণ শরীরের গ্রন্থি এবং স্পাইনাল কলামের কার্টিলেজগুলি বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শুকিয়ে আসতে থাকে।

এবার মেয়েদের উচ্চতা নিয়ে দু'চার কথা বলা-যাক। মেয়েরা ছেলেদের তুলনায় একটু বেঁটে হয় তা আমরা লক্ষ্য করি। এর মূল কারণ, মেয়েদের শরীরে অ্যানড্রোজেন জাতীয় হরমোন ছেলেদের তুলনায় কম। এতে মেয়েদের মেরুদণ্ডের বৃদ্ধিও কম হয়। আমরা জানি মানুষের ৪৬ টি ক্রোমোজোমের মধ্যে মাত্র দুটি যৌন ক্রোমোজোম থাকে যার দ্বারা ছেলে বা মেয়ের পার্থক্য ঠিক হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে এই ক্রোমোজোম দুটি সমগুণ সম্পন্ন বা একই ধরনের। আর ছেলেদের ক্ষেত্রে ক্রোমোজোম দুটি আলাদা। কোনো কোনো সময় দেখা যায় যে এ'দুটি ক্রোমোজোম ছাড়াও একটি বাড়তি যৌন-ক্রোমোজোম কোষে থাকে। এরকম বাড়তি যৌন ক্রোমোজোম থাকলে ছেলেমেয়েরা সাধারণত বেশ লম্বা হয়। তবে এই বাড়তি ক্রোমোজোমের ছেলেমেয়ের সংখ্যা খুবই কম। দুতিন হাজারে একজন এরকমটি দেখা যায়। যৌন ক্রোমোজোম ছাড়া অন্যান্য ক্রোমোজোমের মধ্যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য দেখা দিলে উচ্চতার পার্থক্য দেখা যায়। কয়েকটি নির্দিষ্ট সংখ্যার ক্রোমোজোমের গঠনে কোনোরূপ অস্বাভাবিকতা দেখা দিলে শিশু বেঁটে হয়। তবে তেমন শিশুর আয়ু খুব কম হয়।

শিশু যখন বড়ো হতে শুরু করে তখন তার ভালো খাদ্যের প্রয়োজন হয়। সেই খাদ্যের মধ্যে প্রোটিনের প্রয়োজন খুব বেশি। এই প্রোটিন মূলত হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিড জাতীয় যৌগ। শরীরের প্রয়োজনে যতরকম অ্যামিনো অ্যাসিড দরকার হয় তার অর্ধেক পরিমাণ আসে বিভিন্ন খাদ্যের মাধ্যমে। বাকী অর্ধেক শরীর নিজেই তৈরী করে নেয়। এই প্রয়োজনীয় অ্যামিনো অ্যাসিডের মধ্যে দুটি অ্যামিনো অ্যাসিড শরীরের উচ্চতাবৃদ্ধির সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক রাখে। এই দুটি হচ্ছে লাইসিন ও মিথিওনিন। আমরা জানি লম্বা হবার জন্য প্রয়োজন উপযুক্ত ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস। সুতরাং শরীরের বৃদ্ধির জন্য খনিজ লবণ ও ভিটামিনের প্রয়োজন হয়। এগুলি খাদ্য বা ট্যাবলেট আকারে শরীরের প্রয়োজন হয়। হাড়ের বৃদ্ধিতে ও চোখ ভাল রাখার জন্য প্রয়োজন হয় ভিটামিন 'এ' -এবং ভিটামিন 'সি'। ভিটামিন

'ডি' -এরও প্রয়োজন আছে যথেষ্ট । এর জন্য অনেকে শিশুকে ভিটামিন 'এ' এবং 'ডি' তেল মাখান ও রোদে শুইয়ে রাখেন । শরীরের বৃদ্ধির জন্য ক্যালসিয়াম ও ফসফরাসের প্রয়োজন হলেও, যথেচ্ছ পরিমাণে ক্যালসিয়াম ট্যাবলেট খাওয়ানো ঠিক নয় । বাচ্চাকে সুস্থ রাখতে মশলাবিহীন সহজপাচ্য খাদ্য দিলেই শরীর সহজে বাড়তে পারে । দুধ, ডিম, মাছ, শাকসবজী খেলেই শরীর ঠিকভাবে বেড়ে ওঠে ।

শিশুদের বেশি পরিমাণ মিষ্টি বা তেল-ঘি জাতীয় খাদ্য দেওয়া উচিত নয়, এতে পিটুইটারী গ্রন্থি থেকে গ্রোথ হরমোন নিঃসরণ কমে যায় । লেটুস বা পেঁয়াজ এই ধরণের খাদ্য শিশুদের কম দেওয়াই ভাল, কারণ এগুলি অন্ত্র থেকে রক্তে ক্যালসিয়াম শোষণে বাধা দেয় । যে সব প্রোটিন থেকে সহজে অ্যামিনো অ্যাসিড পাওয়া যায় সেগুলি ক্যালসিয়াম শোষণে সাহায্য করে । সেরকম প্রোটিন খাদ্য খাওয়া ভাল । এতে গ্রোথ হরমোনের পরিমাণ বাড়ে। বিভিন্ন আসন বা ব্যায়াম করে লম্বা হওয়া যায় । তবে তা ২২ থেকে ২৫ বছরের পর আর সম্ভব হয় না । আসন বিশেষজ্ঞরা বলেন, উষ্ট্রাসন, অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন, সর্বাঙ্গসন, ধনুরাসন প্রভৃতি লম্বা হতে সাহায্য করে । ছেলে বা মেয়ের লম্বা হওয়ার ব্যাপারটা অনেকটা নির্ভর করে তাদের বাবা ও মায়ের উচ্চতার উপর । অর্থাৎ বংশগতির ধারাই ঠিক করে সন্তান লম্বা না বেঁটে হবে । এ পর্যন্ত বিশ্বের সবচেয়ে লম্বা মানুষটি হলেন মার্কিন দেশের রবার্ট ওয়ার্ডলো । তাঁর উচ্চতা ছিল প্রায় ৭ ফুট । লম্বা বা বেঁটের ব্যাপারে বংশগতির একটা প্রভাব আছে ঠিকই, তবে এছাড়া আরও নানা কারণ লুকিয়ে আছে এর পেছনে । জাতিগত প্রভেদ ও ভৌগোলিক অবস্থানের ওপর মানুষের চেহারা, গড়ন প্রভৃতি নির্ভরশীল হয় । ইউরোপের নরয়ের মানুষেরা সাধারণত লম্বা হয়, আর রুমানীয়দের গড়উচ্চতা ভারতীয়দের মত । ভারতীয়রা পিগমীদের তুলনায় লম্বা হলেও, ইউরোপ ও মার্কিন লোকদের তুলনায় বেঁটে । পরিবারের সন্তান সংখ্যার উপরেও ছেলেমেয়েদের গড় উচ্চতা নির্ভর করে । যাঁদের একটি সন্তান, সেই সন্তান অন্য পরিবারের একাধিক সন্তানদের চেয়ে সাধারণত লম্বা হয় ।

সুতরাং লম্বা হওয়ার ব্যাপারে বংশগতির নিয়ম ও প্রকৃতিগত নিয়ম দুটোই কাজ করে ।

সাঁতার ও জলচর শিশু



নদী বা সমুদ্র দেখে অনেকের মনে ছ্যাঁৎ করে একটা ভয়ের ভাব জেগে ওঠে ঠিকই, কিন্তু যারা সাঁতারু বা ডুবুরি তাদের কাছে নদী বা সমুদ্র যেন অতি আপনার, একান্তই নিজস্ব। ডুবুরিরা জলের নিচে অনেকক্ষণ থাকতে পারে। এছাড়া সাবমেরিন বা ডুবোজাহাজে চেপেও মানুষ বহু সময় জলের নিচে কাটাতে পারে। কিন্তু কোন বিশেষ পোষাক না পরে বা কোন কৃত্রিম ব্যবস্থা ছাড়া জলে ডুব দিয়ে থাকার বিশ্বরেকর্ড হল ক্যালিফোর্নিয়ার রবার্ট এল ফস্টারের। তিনি জলের নিচে ডুবে ছিলেন ১৩ মিনিট ১৪ সেকেণ্ড। এই বিশ্বরেকর্ডের চেয়ে বহুগুণ সময় জলে ডুবে থাকার নুতুন নজীর গড়ে কৃষ্ণনগরের একটি ছেলে। নাম প্রদীপ রায়। সে জলের নিচে ১২ ঘন্টা ডুবে থেকে আবার উঠে আসে। এই ঘটনার সাক্ষী স্থানীয় বহুলোক এবং প্রদীপ এজন্য পশ্চিম দিনাজপুরের জেলাশাসক এবং কাটোয়া ও লালবাগের মহকুমা শাসকের সার্টিফিকেট লাভ করেছে। তাকে ডাক্তারী পরীক্ষাও করা হয়েছিল। এই জলে ডুবে থাকার ব্যাপারটা বিশেষ নজীর তখনই হবে যখন তা উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ অনুষ্ঠানে পুনরায় দেখান সম্ভব হবে। ওপরের এই সংবাদটি ১৯৮৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাসে (২৫.৬.৮৩) যুগান্তরে প্রকাশিত হয়।

দু'একটা ঘটনাকে বাদ দিয়ে আমরা বলতে পারি যে, জলের মধ্যে ডুব দিয়ে মানুষ বেশিক্ষণ কাটাতে পারে না। ডুব দিয়ে জলের নিচে কিছুদূর যাওয়া যায় এবং অল্পক্ষণের মধ্যে আবার ওপরে উঠে আসতে হয় প্রাণ বাঁচাবার তাগিদে।

জলের নিচে অক্সিজেন নিয়ে যদি কেউ নিচে নামতে চায় তবে তা সম্ভব হয়। ডুবুরিরা বিশেষ ধরণের পোষাক পরে অক্সিজেনের ব্যবস্থা করে জলের নিচে নেমে পড়ে। আধুনিক সব বন্দরে ডুবুরির একান্ত প্রয়োজন হয়। জলের নিচে নেমে জাহাজের নিচের অংশটা পরীক্ষা ও প্রয়োজনীয় মেরামত ডুবুরীরা করে থাকে। কোন জাহাজ যখন ডুবে যায় তখন সেই জাহাজের মালপত্র উদ্ধারের কাজে এবং সাগরের নিচ থেকে মুক্তা ও দামী নানা পদার্থ সংগ্রহ করে থাকে ডুবুরিরা। এরা সাধারণত রবারের পোষাক পরে এবং মাথায় শিরস্ত্রাণ লাগিয়ে জলের গভীরে নেমে পড়ে। চোখের কাছে তখন তাদের থাকে দুটো শক্ত মোটা কাচ। এই পোষাক পরলে ডুবুরির মুখে কোন জল ঢুকতে পারে না এবং সে তার শ্বাস-প্রশ্বাস নেয় একটা রবারের নলের সাহায্যে। নলটির একপ্রান্ত জাহাজ বা নৌকোর সঙ্গে জলের ওপরে থাকে। ডুবুরিদের গতিবিধি ওপর থেকে জানার জন্য তার কোমরে দড়ি বাঁধা থাকে। ডুবুরির অসুবিধা হলে এই দড়ি ধরে তাকে টেনে ওপরে তোলা হয় ধীরে ধীরে। ডুবুরির সাজসরঞ্জাম ধীরে ধীরে উন্নত হয়। এডমণ্ড হেলি নামে এক ভদ্রলোক কাঠের বেল তৈরি করেন এবং কয়েক জনকে নিয়ে ১৮ মিটার জলের নিচে এক ঘন্টারও বেশি সময় কাটিয়ে দেন। এরপর লোহার বেল প্রস্তুত করেন জন স্মিরাটন।

জাহাজ নদী বা সমুদ্রে চলাচল করে অর্থাৎ জলের ওপরে তা ভাসিয়ে একটা নির্দিষ্ট দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। এই জাহাজই আবার জলের ভেতরও চলাফেরা করতে পারে। তখন তার নাম ডুবোজাহাজ বা সাবমেরিন। এই ধরনের জাহাজে থাকে লোহার এক চৌবাচ্চা। সেটা খালি থাকলে জাহাজ জলের ওপর ভেসে থাকে আর তা জলে ভরে ফেললে তা ধীরে ধীরে জলের নিচে চলে যায়। চৌবাচ্চায় জল কমিয়ে বাড়িয়ে জাহাজকে ইচ্ছেমত জলে ডুবানো যায়। জল ভরবার বা খালি করবার জন্য বড়বড় পাম্প কলের ব্যবস্থা থাকে এবং এর সাহায্যে এক মিনিটের মধ্যেই জাহাজকে বেশ কয়েক মিটার নিচে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। ডুবোজাহাজে করে ২৪ ঘন্টার বেশি জলের নিচে থাকলেও কোন রকম কষ্টবোধ হয় না। ডুবোজাহাজে করে আজকের দিনে হাজার হাজার মাইল যাওয়া যায়।

এতক্ষণ জলে ডুবে থাকার রেকর্ড, ডুবুরির কথা ও ডুবোজাহাজ নিয়ে বলা হল। এবার আমরা সাঁতার প্রসঙ্গে আসি। সাঁতার যদিও নানা রকমের হয় তবু সহজ কথায় সাঁতার মানে হচ্ছে জলের মধ্যে হাত ও পা চালিয়ে এগিয়ে যাওয়া। শরীরচর্চার নানা পদ্ধতির মধ্যে সাঁতারও একটি। নিয়মিত সাঁতার কাটলে শরীর সুস্থ থাকে। আমাদের দেশে সাঁতার নিয়ে যতটা চিন্তা ভাবনা করা হয় তার চেয়ে অনেক বেশি চিন্তা ও তার রূপদান করা হচ্ছে সোভিয়েত ইউনিয়নে। ঐদেশে শীতকালেও বহুলোক সাঁতার কাটে এবং সেইসব সাঁতারপ্রেমীদের সিন্ধুঘোটক বলে।

বিশেষ সাঁতার ক্লাবের সদস্য হতে হয় এজন্য। প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সময়েও সাধারণত তরুণ ও মধ্যবয়সীরা সাঁতার কাটতে এগিয়ে আসেন। এতে তাঁদের শরীর মজবুত থাকে অর্থাৎ যৌবন দীর্ঘস্থায়ী হয় এবং বহুরোগ থেকে তাঁরা মুক্তি পান। তাঁদের স্বাস্থ্য দেখে তাদের বয়স অনুমান করা কঠিন হয়ে পড়ে।

আমাদের দেশের অনেক ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাসনা জাগে দূরপাল্লার সাঁতারু হবার। তারা স্বপ্ন দেখে মিহির সেন, ব্রজেন দাস, আরতি সাহা প্রভৃতির। অনেকে আবার সাঁতার প্রতিযোগিতায় পুরস্কার লাভের চিন্তা করে। অলিম্পিকের খ্যাতনামা সাঁতারুদের চিন্তা তাদের অনেক সময় ঘিরে রাখে। কিন্তু বাস্তবে তা হতে হলে চাই দীর্ঘ অনুশীলন ও উপযুক্ত ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা। কিশোর ও যুবকরাই সাধারণত সাঁতার কাটতে ভালোবাসে। শহরে বিভিন্ন সুইমিং পুলে এবং গ্রামে পুকুরেই ছেলেমেয়েরা সাঁতার কাটে। সাঁতার এখন ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেরও কাটতে দেখা যায়। আমাদের দেশে সচরাচর ২-৩ বছরের কম বয়সী শিশুদের সাঁতার কাটতে দেখা যায় না। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নে একেবারে দুধের শিশুদেরও সাঁতার শেখান হয়। সেখানে ১৫ দিনের শিশুকেও এই আওতায় আনা হয়। এক থেকে দু-মাস বয়সের অগণিত শিশুরা সাঁতার শেখে অর্থাৎ বসা, দাঁড়ান ও হাঁটার আগেই বহু শিশু সাঁতার শিখে যাচ্ছে। একেবারে শিশুদের ক্ষেত্রে (১৫ দিন থেকে ৪ মাস পর্যন্ত) ঘরে বাথটাবে সাঁতারের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। শিশুবিশেষজ্ঞ ডাক্তাররা সাঁতারের ওপর যথেষ্ট গরুত্ব দিচ্ছেন সেখানে।

শিশুরা কেমন সাঁতার কাটে – তা দেখানোর জন্য মস্কোর কসমস হোটেলের কংগ্রেস হলে সম্প্রতি এক সাঁতার প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এতে নানা দেশের বিজ্ঞানী ও সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। সেখানে মার্কিন দম্পতির ১৫ দিনের এক সন্তানের সাঁতার দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়। শিশুটির নাম সাশা ক্রামল্যাণ্ড। শিশুটি হোটেলের সুইমিং পুলে সাঁতার কেটে উপস্থিত সকলকে অবাক করে দিয়েছিল, যদিও সে জানত না যে সে সাঁতার কাটছে কারণ তা বোঝার বয়স তারা, হয় নি। এই ছোট্ট শিশুটিকে সাহায্য করেছিল চার মাসের ছেলে সোভিয়েতের কোলিয়া কসিৎস্কি। ১৫ দিনের শিশুটি যখন মাঝে মাঝে জল গিলে ফেলছিল তখন চার মাসের শিশুটি তাকে সাহায্য করছিল অবশ্য সাঁতারের সময় তাদের প্রশিক্ষকও ছিলেন।

যে সব শিশুদের নিয়ে এই সাঁতার প্রদর্শনী হয়েছিল তারা সবাই জন্মেছে জলতলে। ইগর চারকভস্কি যে পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন সেই পদ্ধতিতে শিশুরা সাঁতার শিখেছিল। ইগর চারকভস্কি শিশুদের জলের নিচে জন্মাবার ব্যবস্থা করান। তাঁর মত হচ্ছে এভাবে জন্মালে জলজ প্রাণির যাবতীয় সহজাত প্রবৃত্তির অধিকারী হয় শিশুরা। কসমস হোটেলের সাঁতার প্রদর্শনী ও শিশুদের জলতলে জন্মের কথা (ছবি-



সহ) সোভিয়েত ইউনিয়ন পত্রিকায় (নং -২,১৯৮৫) প্রকাশিত হয়।

চারকভস্কির পদ্ধতির কথা নানা পত্রিকা এবং বইয়ে পড়ে জেরাল্ড ক্রামল্যাণ্ড এবং স্ত্রী আনাকস্টা লেনিনগ্রাদে আসেন। সেখানেই তাঁদের সন্তান সাশা ক্রামল্যাণ্ডের জন্ম হয়। তাঁদের শিশুটি নিয়েই মস্কোর সাঁতার প্রদর্শনী হয়। এই প্রদর্শনীর পর জেরাল্ড ও আনার মনের দ্বিধা দূর হয়েছিল একং ঘটনাটি তাঁদের চারকভস্কির আবিস্কৃত পদ্ধতিকে সমর্থন করল। চারকভস্কির মতে, জলতলে জন্ম হলে মানুষের মধ্যে এমন ক্ষমতা আসে যা স্বাভাবিক স্থলভাগে হলে আসে না। জলতলে শিশুর জন্মদান অনেকটা সহজ হতে পারে এবং সেখানে শিশুর মাকে মহাকর্ষের বিরুদ্ধে তুলনামূলকভাবে কম শক্তি ব্যয় করতে হয়। এতে শিশুর পীড়ন কম হয় এবং পরিবেশের আকস্মিক পরিবর্তন ঘটে না। এর ফলে মানসিক গঠন ঠিক থাকে। এরকমটি হওয়ার কারণ হচ্ছে যে শিশু তো মায়ের গর্ভে তরলের মধ্যেই থাকে।

চারকভস্কি ও তাঁর সহকর্মীদের এই কাজ এখন বিজ্ঞানীদের দ্বারা স্বীকৃতি লাভ করেছে। এখন তাঁরা শিশু ও বয়স্কদের মনে ডলফিনের প্রভাব নিয়ে গবেষণা করছেন। চারকভস্কি দেখেছেন যে জলতলের শিশুদের স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকে এবং তাদের বৃদ্ধি খুব দ্রুত হয়। এবং তুলনামূলকভাবে তারা অন্যান্য স্থলভাগের শিশুদের চেয়ে অনেক কম অসুস্থ হয়। বুদ্ধি ও শারীরিক বিকাশও তাদের ক্ষেত্রে অনেক বেশি হয়। দেখা গেছে অনেক শিশু ও তাদের মায়েদের ডলফিন নানাভাবে সমুদ্রে সাঁতারের কাজে সাহায্য করে এবং তাদের সাহায্যে মহিলারা অনেক সুস্থভাবে সন্তান প্রসব করতে পারেন। মা ও শিশুর জলের ভীতি একেবারেই চলে যায় এবং ডলফিন তাদের কাছে এক অজ্ঞাত কারণে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করে।

উপরের আলোচনা থেকে আমরা জানতে পারলাম যে জলচর শিশুরা অর্থাৎ অল্প বয়সের সাঁতার কাটা শিশুরা অন্যান্য শিশুদের চেয়ে ২-৩ মাস আগেই হাঁটতে ও কথা বলতে পারে এবং অসুখেও ভোগে কম। এছাড়া সাঁতার জানা শিশুদের শরীরের গঠন সুন্দর ও সুদৃঢ় হয়। সবশেষে সাঁতার কাটা সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সন্তরণ ফেডারেশনের চেয়ারম্যান ফিসোর্ভ যে যে পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলি তুলে ধরা হলো।

১) শিশুর ১৫ দিন বয়স থেকেই সাঁতার শেখানোর কাজ শুরু করা উচিত এবং নিয়মিতভাবে তা চালিয়ে যেতে হবে। সপ্তাহে ৫-৬ বার।

২) শুরুতে সাঁতারের সময় হবে ৫-১০ মিনিট। দ্বিতীয় মাসে ২০ থেকে ৩০ মিনিট। চতুর্থ মাসে ৪০ থেকে ৪৫ মিনিট এবং ছ মাসের পর ১ ঘন্টা করে।

৩) শুরুতে জলের উষ্ণতা হবে ৩৭° সেলসিয়াস এবং প্রতি মাসে ১ ডিগ্রী করে কমাতে হবে।

৪) জলের ভেতর দেহ চালানো এবং এগিয়ে যাওয়া হচ্ছে শিক্ষাদানের ভিত্তি। এ সময় বাচ্চার মাথায় এবং বুক বা পিঠের নিচে হাত দিয়ে ধরে রাখতে হবে।

৫) জলের নিচে শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ রাখার অভ্যাস করতে হবে এবং শিশুকে তা ধীরে ধীরে শেখাতে হবে। এটি আত্মরক্ষার উপায় বলা চলে। শিশুদের মুখে ও ঠোঁটে অল্প করে জল দিয়ে শ্বাসরোধের প্রক্রিয়া শেখান যেতে পারে।

৬) প্রথমে চিৎ অবস্থায় এবং পরে উপুড় করা অবস্থায় সাঁতার শেখান উচিত। তৃতীয় মাস থেকে তাকে ডোবাতে শুরু করা উচিত নানাভাবে (খাড়া, উপুড় ও চিৎ অবস্থায়)।

৭) শিশুকে বিশ্রাম দিতে হবে। প্রথমে তিন মিনিট অন্তর এবং পরে ৫ থেকে ১০ মিনিট অন্তর।

৮) শিশুর ওপর বলপ্রয়োগ করা চলবে না। এতে শিশু কাঁদবে। শিশুরা যদি স্বাভাবিক অবস্থায় কাঁদে তাহলে তাকে নানাভাবে ভোলানোর চেষ্টা করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনে সেদিনের মত সাঁতার বন্ধ রাখতে হবে।

বাঁ-হাতি



আমরা অনেক সময় কিছু কিছু লোককে দেখি যাঁরা ডানহাতের চেয়ে বাঁহাতকে লেখা বা কাজে বেশি ব্যবহার করেন । এঁদেরকে আমরা ন্যাটা বা ল্যাটা বলে থাকি । পৃথিবীতে বেশ কিছু খ্যাতিমান লোক আছেন বা ছিলেন যাঁরা 'বাঁ-হাতি' । ক্রিকেট খেলোয়ার চাঁদু বোরদে, গ্রাহাম লিলি, ট্রুম্যান প্রভৃতিরা ছিলেন বাঁ-হাতি । এছাড়া আরও অনেক বিখ্যাত লোক, যেমন লিওনার্দো দ্য-ভিঞ্চি, বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন, চার্লি চ্যাপলিন—এঁরাও ছিলেন বাঁ-হাতি । আবার এমন লোকের কথাও শোনা যায় যাঁরা দু'হাতকেই সমানভাবে ব্যবহার করতে পারেন । এদেরকে বলা হয় সব্যসাচী ।

সাধারণত ডান হাতকেই বেশির ভাগ লোক বাঁ-হাতের তুলনায় বেশি ব্যবহার করেন । এই কম ব্যবহারের হাতে সিদ্ধহস্ত অর্থাৎ বাঁ-হাতে সিদ্ধহস্ত বললে গালি দেওয়া বোঝায় । মানুষের মধ্যে যে বাঁ-হাতি ব্যাপারটা লক্ষ্য করা যায়, অন্যান্য প্রাণীদের ক্ষেত্রে তা খুব একটা লক্ষ্য করা যায় না । তাই বানর, ভালুক বা শিম্পাঞ্জি প্রভৃতি প্রাণীদের দেখা যায় যে তারা দু'হাতকেই সমান ব্যবহার করে ।

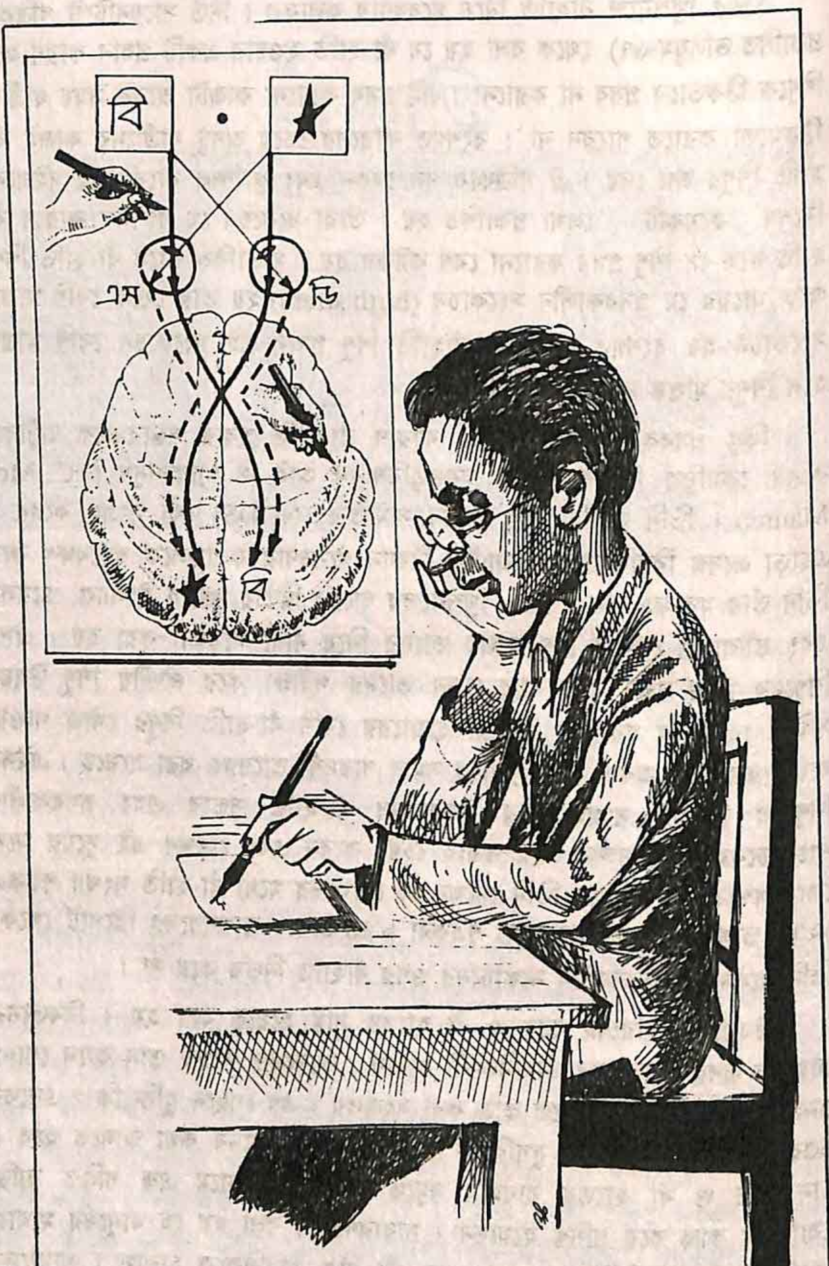
আমরা মানুষেরা ডানহাত দিয়ে খাওয়া-দাওয়া, পূজা বা লেখার কাজ করে থাকি কারণ ডানহাতকে পবিত্র মনে করি । পবিত্র কাজে পবিত্র হাতের ব্যবহার করাই উচিত এরকম একটা ধারণা আমাদের অনেকের আছে । পৃথিবীতে যে সব যন্ত্রপাতি তৈরী হয় সেগুলি মূলত ডানহাতের পক্ষেই বেশী উপযোগী । তবে

বাঁহাতের উপযোগী যন্ত্রও প্রয়োজনে বানানো হয়।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে বাঁহাতি নিয়ে গবেষণার ফলাফল (নিউ সায়েনটিস্ট পত্রিকায় প্রকাশিত ভলিয়ুম-৬৭) থেকে বলা হয় যে বাঁ-হাতি হওয়ার একটি প্রধান কারণ হচ্ছে শিশুকে ঠিকভাবে প্রসব না করানো। এই প্রসব করানো কাজটা অনেক সময় ধাত্রীরা ঠিকমতো করাতে পারেন না ! বংশগত কারণের চেয়ে অপটু ধাত্রীদের কাজই বাঁ-হাতি শিশুর জন্ম দেয়। ঐ পত্রিকায় পল বেকন এবং ফ্রান্সিল বার্নেস এই দুইজনের বিশেষ কয়েকটি লেখা প্রকাশিত হয়। তাঁরা বলেছেন যে বংশগত কারণে বাঁ-হাতি হলে সে শিশু প্রসব করানো বেশ কষ্টকর হয়। স্বাভাবিক ভাবে বাঁ-হাতি শিশুর জন্মে মায়ের যে প্রসবকালীন সংকোচন (birth stress) হয় তার থেকে বেশি মাত্রায় সংকোচন হয় বংশগত কারণে। বাঁহাতি শিশু প্রসবে এই সংকোচন বেশি মাত্রায় হলে শিশুর মস্তিষ্ক দুর্বল হয়।

কিন্তু প্রসবকালীন সংকোচনের কারণে বাঁ-হাতি হবার সম্ভাবনাকে অস্বীকার করেন কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের মনস্তত্ববিশারদ আই. সি ম্যাকমানুস (I.C. Mc. Manus)। তিনি জাতীয় শিশু উন্নয়ন সমিতি'র (NCDS) তথ্য সংগ্রহ করেন। এছাড়া এসেক্স বিশ্ববিদ্যালয়ের জাতীয় বিজ্ঞান গবেষণার ফলাফলকে পর্যবেক্ষণ করে তিনি তাঁর মতামত দেন। ১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দের মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহে ইংল্যাণ্ড, ওয়েলস এবং স্কটল্যাণ্ডে যে সব শিশু জন্মায় তাদের নিয়ে নানা গবেষণা করা হয়। ঐসব শিশুদের বয়স যখন সাত বছর তখন তাদের পরীক্ষা করে জাতীয় শিশু উন্নয়ন সমিতি। তাঁদের পরীক্ষায় এগারো হাজারের বেশি বাঁ-হাতি শিশুর খোঁজ পাওয়া যায়। এর মধ্যে অবশ্য যারা দু'হাতে সমান পারদর্শী তাদেরও ধরা হয়েছে। এইসব শিশুদের রিপোর্ট সংগ্রহ করে ম্যাকমানুস বাঁ-হাতি স্বভাব এবং প্রসবকালীন সংকোচনের মধ্যে সম্পর্ক বার করার চেষ্টা করেন এবং দেখেন এই দুয়ের মধ্যে কোন সম্পর্ক নেই। তবে তিনি দেখেন যে ছেলেদের মধ্যে বাঁ-হাতি সংখ্যা শতকরা ১২˙৮১ ভাগ এবং মেয়েদের মধ্যে শতকরা ৯˙৬৪ ভাগ। ডাক্তারদের রিপোর্ট থেকে তিনি বলেন যে প্রসবকালীন সঙ্কোচনের ওপর বাঁহাতি নির্ভর করে না।

বিবর্তনের কারণেই ডান ও বাঁ হাতের সৃষ্টি হয়েছে বলা হয়। বিবর্তনের কারণের উপর জোর দেন জীববিজ্ঞানী মেনার্স। অনেকের পক্ষেই ডান কানে শোনা, ডান চোখে দেখা, ডান হাতে কাজ করা সহজতর। এর পেছনে যুক্তি কি ? এসবের উত্তর পেতে হলে অধ্যাপক চুপরিকভ ও অন্যান্য গবেষকদের কথা জানতে হবে। ডান হাত ও বাঁ হাতের ব্যবহার সম্বন্ধে কিরিলবার্ড নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তি এব্যাপারে কাজ করে প্রসিদ্ধ হয়েছেন। সাধারণভাবে বলা হয় যে মানুষের মাথার ডানদিক শরীরের বাঁদিককে চালায় এবং বাঁ দিক ডানদিককে চালায়। আমাদের মস্তিষ্ক দুটো অংশে ভাগ করা। আকৃতির দিক দিয়ে দুটো অংশই সমান। কিন্তু



বি
এস
ডি
বি

দেখা যায়, একদিক অন্যদিকের চেয়ে বেশি কাজের। মস্তিষ্কের বাঁ আর ডান যে দুটো অংশ আছে তার মধ্যে বাঁ দিকটাই বেশি কাজের। যেহেতু মস্তিকের বাঁ-দিকটা ডানদিকের চেয়ে বেশি কাজের, সেজন্য ডানদিকের হাত বেশি কাজে আসে। সেই কারণেই বেশির ভাগ লোক ডান হাতে লেখেন বা কাজ করেন। তবে বাঁ হাতি লোকেদের ক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ডান দিকটাই বেশি সক্রিয়। ভরশিলভগ্রাদ মেডিক্যাল ইনস্টিটিউটের মনোরোগ চিকিৎসা বিভাগের প্রধান চুপারকভ বলেন যে ন্যাটা লোকেরা ডানহাতিদের দুনিয়ায় মোটেই ভালবোধ করে না। কখনও কখনও তাদের মধ্যে এক ধরণের মানসিক চাপ পড়ে। এই মানসিক চাপকে বলে ডেকস্ট্রাস্ট্রেস। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে জানা গেছে যে মস্তিষ্কের ডান ও বাঁ গোলার্ধের মধ্যে মৌলিক ও সুস্পষ্ট পার্থক্য আছে। বাঁয়েরটি বাকশক্তি এবং ডানেরটি উপলব্ধি নিয়ন্ত্রক। মস্তিষ্কে দুটি গোলার্ধ একই জীবনের সঙ্গে জড়িত থাকলেও, একটি অন্যটির চেয়ে বেশি সক্রিয়তর।

যে কোন রোগ শরীরের সেইসব জায়গা বেছে নেয় যেখান থেকে বাধা কম আসে। ন্যাটা সৃভাব এক বিশেষ প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রিয় স্নায়ুতন্ত্রের নানারোগকে বদলায়। বিভিন্ন সমস্যার ওপর পরীক্ষা করে অধ্যাপক চুপরিকভ এবং অধ্যাপক গুরোভা এক চিকিৎসা পদ্ধতির নাম করেছেন যাকে বলা হয় পার্শ্বীয় ভৌত চিকিৎসা বা 'Filát'। এই পদ্ধতিতে সুস্থ গোলার্ধে খুব সামান্য তড়িৎপ্রবাহ পাঠিয়ে একজনকে সক্রিয়তর করে তোলা হয়। এতে মস্তিষ্কের অন্য গোলার্ধের রোগের বিরুদ্ধে তা কাজ করে। এইভাবে মনোবিকার রোগে এটি কাজে আসে।

পার্শ্বীয় চিকিৎসার অন্য এক ধরণ হল মনোঅ্যারেল সম্মোহন চিকিৎসা (MAG)। এতে একটি স্টিরিও টেপরেকর্ডারে মনোচিকিৎসাগত সম্মোহন কর্মসূচি রেকর্ড করা হয়। এর কোন একটি ডান বা বাঁ কানে রোগী হেডফোনের সাহায্যে শোনে। যে সব রোগী এই চিকিৎসায় সাড়া দেয় না, তাদের ক্ষেত্রে বাঁ কানের কর্মসূচিতে সম্মোহন সাধ্যতা বাড়ে, ভালো ঘুম হয়, দুশ্চিন্তা দূর হয়, ধমনীর রক্তচাপ কমে, ডানকানটিতে উচ্ছলতা বাড়ে এবং মনের গ্লানিভাব কমে।

মস্তিষ্কের কার্যগত অপ্রতিসাম্য নিয়ে রাশিয়ান বিজ্ঞানী ভিওলেত্তা গবেষণা করেন। তিনি শিশুদের মধ্যে যারা ন্যাটা তাদের মধ্যে খারাপ মেজাজ, কম ঘুম প্রভৃতির প্রকোপ বেশিমাত্রায় হয় তা লক্ষ্য করেন। ডাঃ ভিওলেত্তা শিশুদের ওপর পার্শ্বীয় অ্যানথ্রোপইসোমেট্রি প্রয়োগ করেন। তিনি মস্কোর আটশো স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের পরীক্ষা করে দেখেন যে ১-৯ বছর বয়সীদের মধ্যে দশভাগ ন্যাটা। ১৪-১৫ বছরের মধ্যে এই ন্যাটার সংখ্যা দাঁড়ায় ৪˙৩ শতাংশ এবং ১৬-১৮ বয়সীদের মধে পৌছয় ৩.৪ শতাংশ। তিনি মনে করেন যে, কোন শিশুর ক্ষেত্রে সুবিধাজনক হাতের বিকাশ ১৫-১৮ বছর পর্যন্ত আটকে থাকে। এই ন্যাটা হওয়ার সংখ্যা কমে

আসে এই কারণে। পুরোপুরি যারা ন্যাটা তারা ন্যাটা হয়েই জন্মায়।

কোন ডান হাতি লোককে বাঁ-হাতি করার চেষ্টা করা হলে অনেক সময় শরীরে অন্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। ন্যাটা শিশুকে প্রশিক্ষণ দিয়ে ডান হাতি করতে গেলে অনেক সময় তার ফলাফল খারাপই হয়। এতে তোতলামি, চর্মরোগ, মূত্রাশয়ে অসাড়তা বা হাঁপানি দেখা দিতে পারে। শিশু যদি ন্যাটা থাকতে না চায় তবেই তাকে ডানহাতি করার চেষ্টা করা যেতে পারে। নচেৎ একাজে সতর্ক হওয়া উচিৎ।

মহিলা ও কোলাহল



কোলাহল থেকে দূরে চলে যেতে চান ? যদি চান তবে শহর ছেড়ে কোন এক অজ পাড়াগাঁয়ে চলে আসুন । যেখানে কলকারখানা নেই, নেই ট্রাম বাসের আওয়াজ । বর্তমানে যেভাবে লোকসংখ্যা ও কলকারখানা বাড়ছে, তাতে কোলাহলও যে বেড়ে যাবে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই । প্রাত্যহিক জীবনে আমরা দেখি, কোন বাজারের যত কাছে যাওয়া যায়, কোলাহলের মাত্রাও ততই বেড়ে যায় । কোলাহলের মাত্রা বেশি হলে বেশ কিছু দূর থেকেই তা ধরা পড়ে । পরীক্ষায় প্রমাণিত য়েছে, যে পুরুষ মানুষের চেয়ে মহিলাদের কাছেই কোলাহল তাড়াতাড়ি ধরা পড়ে । অবশ্য যাঁরা কানে কম শোনেন তাঁদেরকে হিসেবের বাইরে রাখতে হবে ।

দেখা গেছে যে কোলাহল সচেতন এবং কোলাহল-অসচেতন ব্যক্তির মধ্যে যে পার্থক্য থাকে তার পরিমাণ ১০ ডেসিবেলের বেশি । এর দ্বারা তীব্রতার চারগুণের প্রভেদ বা দ্বিগুণ আওয়াজকে বোঝায় । মহিলাদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে যে তাঁরা পুরুষদের চেয়ে ১৩ ডি বি কমেই অস্বস্তিবোধ করেন । এখন কোলাহল বলতে আমরা কি বুঝি ? সুরবর্জিত শব্দকে আমরা কোলাহল বলি । সাধারণত শব্দ সৃষ্টিকারী কোন কম্পনশীল বস্তুর কম্পন সংখ্যা একটা নির্দিষ্টমানের মধ্যে থাকলেই তা শোনা যায় । বায়ুর মাধ্যমে সব রকমের কম্পাঙ্ক আমাদের কানে শব্দের অনুভূতি জাগায় না । শব্দবিজ্ঞানের নিয়ম অনুযায়ী ২০ থেকে ২০,০০০ হার্জ তরঙ্গ সুর শোনা যায় ।



উৎসের কম্পন যদি অনিয়মিত হয়, তবে তার শব্দ কানের কাছে অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। মহিলারাই যে পুরুষদের চেয়ে কোলাহলে বেশি সচেতন, সে ব্যাপারটি জানা গেছে এক বিশেষ অধিবেশন থেকে।

১৯৮০ সালে লণ্ডনে ব্রিটিশ মনস্তাত্ত্বিক সংস্থার একটি অধিবেশন বসেছিল। সেই অধিবেশন থেকেই এ মতবাদটা গৃহীত হয়। মতবাদটি পরিবেশন করেন ওয়্যারউইক বিশ্ববিদ্যালয়ের জে আর টমাস এবং কারডিফের ডি এম জোনস।

তাঁরা নিয়ন্ত্রিত অবস্থায় বিভিন্নভাবে কোলাহল সৃষ্টিকারী প্রশ্ন সাজিয়ে এক পরীক্ষা করেন এবং দেখেন যে ঐ পরীক্ষায় মহিলারাই সাড়া দেয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। তাঁদের পরীক্ষার ফলাফল থেকে তাঁরা সিদ্ধান্তে আসেন যে কোলাহলে মহিলারাই বেশি সচেতন। মহিলারা একথা মেনে না নিলেও পরীক্ষার ফলাফল কিন্তু ঐ সিদ্ধান্তের কথাই বলে।

মহিলারা কথা বেশি বলেন, কিন্তু কেন?

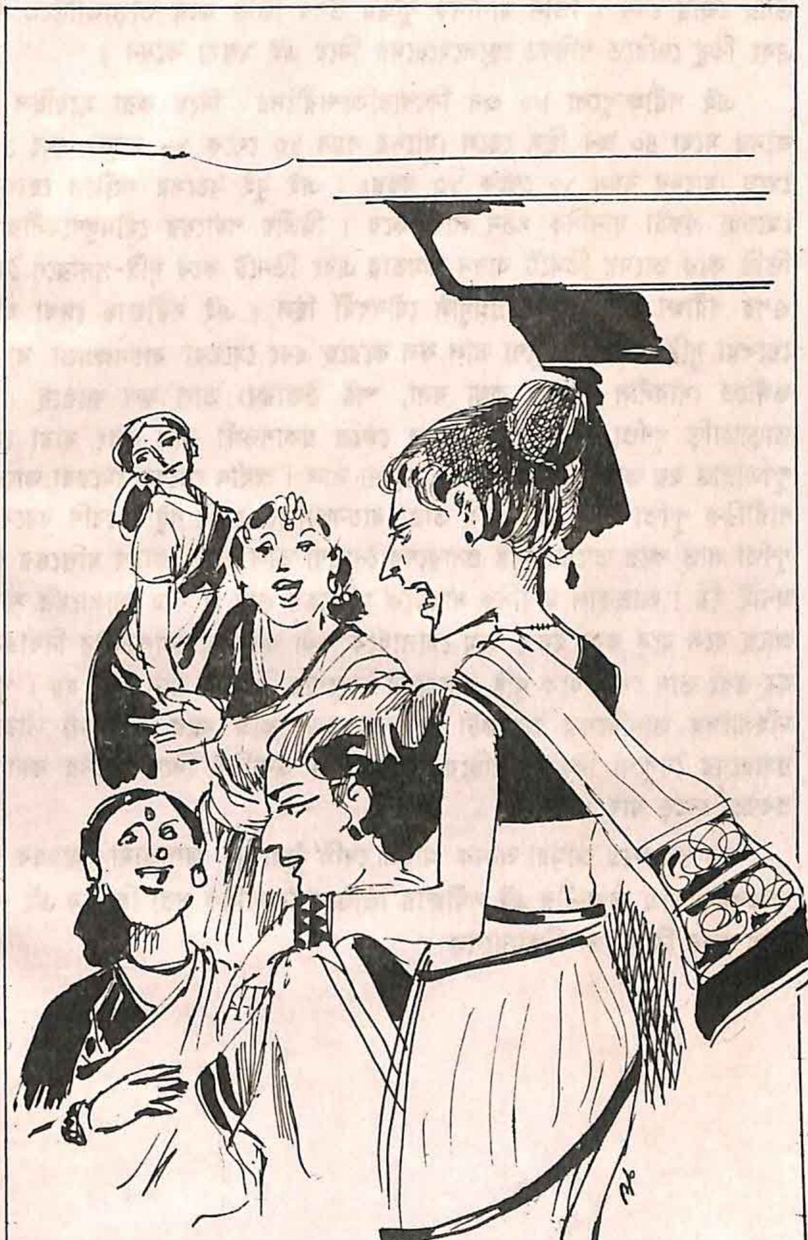


মেয়েদের সম্বন্ধে একটা প্রবাদ চালু আছে যে, মেয়েরা কথা চাপতে পারে না, অর্থাৎ যতই গোপন কথা হোক না কেন মেয়েরা তাদের ঘনিষ্ঠ কাউকে না কাউকে সেই কথা বলে দেবে। মহাভারতে পাণ্ডবদের মা কুন্তী যখন যুধিষ্ঠিরের কাছে কর্ণের পরিচয় দিলেন তখন যুধিষ্ঠির অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন এবং মাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এই বলে –

'শাপ দিব আমি দুঃখ বড় পাই মনে।
গুপ্তকথা ব্যক্ত হবে নারীর বদনে॥
নারীর অন্তরে আর কথা না রহিবে।
অতি গুপ্তকথা হৈলে প্রকাশ হইবে॥ (স্ত্রী পর্ব, মহাভারত)

আজকের দিনেও অনেকে বলেন যে যুধিষ্ঠিরের সেই অভিশাপের ফলেই মেয়েরা কোন কথা গোপনে রাখতে পারেনা। অভিশাপের ব্যাপারটা কতটা সত্যি সে বিষয় সন্দেহ থাকলেও এ বিষয় কোন সন্দেহ নেই যে মেয়েরা বেশি কথার মানুষ এবং এই মতটা বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষার সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করেছেন।

এটা আমাদের জানা যে মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কিছু সময় আগেই শারীরিক পরিণতি লাভ করে। মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন যে পুরুষ ও নারীর বুদ্ধিসত্ত্বার



পেছনে জৈবিক কিছু কারণ আছে। বোস্টনের শিশু হাসপাতালের সাইক্রিয়াটিস্ট ডঃ ডি পি জয়রার পুরুষ ও নারীর বুদ্ধিসত্ত্বা নিয়ে নানা পরীক্ষা করে জৈবিক কারণের উপর জোর দেন। তিনি মানসিক বুদ্ধির উপর ভিত্তি করে তাড়াতাড়িতে পরিণত এবং কিছু দেরিতে পরিণত ছেলেমেয়েদের নিয়ে এই মন্তব্য করেন।

এই পরীক্ষাগুলো ৮০ জন কিশোরকিশোরীদের নিয়ে করা হয়েছিল। ৮০ জনের মধ্যে ৪০ জন ছিল ছেলে (যাদের বয়স ১৩ থেকে ১৬ বছর) এবং ৪০ জন মেয়ে (যাদের বয়স ১০ থেকে ১৩ বছর)। এই দুই বয়সের গণ্ডীতে ছেলেরা ও মেয়েরা একটা মানসিক গঠন লাভ করে। দ্বিতীয় পর্যায়ের যৌনগুণাবলীর উপর ভিত্তি করে তাদের তিনটে বাচন ক্ষমতার এবং তিনটে করে দৃষ্টি-প্রসারণে নৈপুণ্যের ওপর পরীক্ষা করা হয়। প্রশ্নগুলি যৌনধর্মী ছিল। এই পরীক্ষায় দেখা যায় যে ছেলেরা দৃষ্টি প্রসারণ নৈপুণ্যে ভাল ফল করেছে এবং মেয়েরা বাচনক্ষমতা বা প্রকাশ ভঙ্গীতে (সাবলীল গতিতে কথা বলা, স্পষ্ট উচ্চারণ) ভাল ফল করেছে। যারা তাড়াতাড়ি পূর্ণতা লাভ করে তাদের ক্ষেত্রে প্রকাশভঙ্গী ভাল এবং যারা দেরিতে পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয় তারা দৃষ্টি প্রসারণের নৈপুণ্যে ভাল। অর্থাৎ যেহেতু মেয়েরা তাড়াতাড়ি শারীরিক পূর্ণতা লাভ করে তাই তারা বাচনভঙ্গীতে বেশি পটু। বেশি বয়সে যারা পূর্ণতা লাভ করে তাদের দৃষ্টি প্রসারণের নৈপুণ্যে ভাল হবার কারণ মস্তিষ্কের গঠনের জন্যই হয়। আজকাল মানসিক সামর্থকে মস্তিষ্কের ডান ও বাম গোলার্ধের সঙ্গে যুক্ত আছে বলে মনে করা হয়। বাম গোলার্ধকে কথা বলা ও প্রকাশভঙ্গীর নির্ধারক বলা হয় এবং ডান গোলার্ধকে দৃষ্টি প্রসারণের নৈপুণ্যের নির্ধারক মনে করা হয়। পূর্ণবয়স্ক মহিলাদের ডানদিকের অর্ধেকটা বাচনের জন্য কাজ করে। এজন্য তাঁরা দৃষ্টি প্রসারণের নৈপুণ্যে কিছুটা পিছিয়ে পড়েন কিন্তু অন্যদিক দিয়ে তাঁদের কথা বলার প্রবণতা বেড়ে যায়।

বাস্তবক্ষেত্রে আমরা অনেক মহিলা দেখি যাঁরা খুব স্বল্পভাষী। অতএব আমরা কয়েকজন মাত্র বিজ্ঞানীর এই সমীক্ষার ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসেবে এই – তথ্য গ্রহণ করব কি না তা চিন্তাসাপেক্ষ।